রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নববঙ্গ ভারতী প্রেস, ২৯/৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও ৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়

গোলাম কুদ্দুস :: সম্পাদক :: সরোজকুমার দত্ত

বিষয় — পৃষ্ঠা

…: ১৯৫০

নব পর্যায় : তৃতীয় সংখ্যা ফাল্গুন : ১৩৫৬

দাম : আট আনা

পরিচয়

প্রথম সংখ্যার সূচী

দ্বিতীয় সংখ্যার সূচী

বিজ্ঞপ্তি

পরিচয় প্রতি বাংলা মাসের ৩০শে প্রকাশিত হইবে। কম পক্ষে দশ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপির জন্য এক টাকা করিয়া জমা রাখিতে হইবে। আগামী বাংলা মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে গত মাসের বিলের টাকা শোধ করিতে হইবে। এজেন্টদের শতকরা ২৫ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে। প্রতি সংখ্যায় ৫০ কপির বেশী এজেন্সী নিলে শতকরা ৩০ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

টাকা চেক, ড্রাফট্, পোস্টাল অর্ডার, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি চিঠিপত্র নীচের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজনীয়রূপ ডাক টিকিট না পাঠাইলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হইবে না।

চাঁদার হার :—

সডাক বার্ষিক—৬৲ টাকা
সডাক ষাণ্মাসিক—৩৲ টাকা
প্রতি সংখ্যা—৷৷০ আনা

ম্যানেজার—পরিচয়
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১২

রবীন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নববঙ্গ ভারতী প্রেস, ২৯/৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও ৩০৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত

পরিচয়

ফাল্গুন : ১৩৫৬

বিজ্ঞান ও শান্তি

[বোম্বাই-য়ের ৬০,০০০ মজুরের জনসভায় বিশ্ব-শান্তি কমিটির সভাপতি ফ্রেদারিক জোলিও কুরির বক্তৃতা]

কমরেডস !

বোম্বাইয়ের মজুর আপনাদের কিছু বলবার এই সুযোগ পেয়ে আমি যে কত খুশী হয়েছি তাই আপনাদের সবচেয়ে আগে জানাতে চাই।

আপনাদের ভিতর আসতে পেরে আমি আরও খুশী হয়েছি কারণ আমি জানি আপনারাই হচ্ছেন আপনাদের দেশের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। দেশের অতীতের প্রতিনিধি আপনারা নন—যে অতীতের সাথে সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট অন্যায় বিজড়িত।

একমাস আগে আমাদের বোম্বে পৌছান উপলক্ষে আপনাদের কয়েকজন প্রতিনিধি আমাদের যে সংবর্ধনা জানান তা আমি চিরকাল মনে রাখবো, আর মনে রাখবো আমাদের এদেশ পরিত্যাগের পূর্বাহ্নে এই বিপুল জনসভাকে।

আজ একজন বিজ্ঞানী হিসাবে আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই।

আপনারা মনে রাখবেন, যেসব দেশে আজও এমন ব্যবস্থা বর্তমান যে ব্যবস্থায় মানুষ মানুষকে শোষণ করতে পারে, সেই সব দেশে এমন কিছু বিজ্ঞানী আছেন—এবং এঁদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে—যারা সমাজের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে আর রাজী হতে চাইছেন না সেই সব মানুষের সহযোগী হতে, যারা তাদের কাজের ফলকে স্বার্থপর ও ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করছে।

এই বিজ্ঞানীরা এবং টেকনিশিয়ানরা বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সামান্য উপদল মাত্র নন, এঁরা সেই মানুষের দল যাঁরা বিজ্ঞানকে

জনসাধারণের সেবায় নিয়োগ করবার দাবি উত্থাপন করে সত্যিকারের বিজ্ঞান সেবা করছেন। বিরাট মজুর সমাজের সাথে হাত মিলিয়ে তারা আজ এমন এক নতুন দুনিয়া গড়ে তুলতে চাইছেন যেখানে বিরাজ করবে ন্যায় ও শান্তি, যেখানে মানবজাতির বাস্তব ও মানসিক মুক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ভূমিকা হবে তর্কাতীতভাবে সর্বপ্রধান।

এই লক্ষ্যে পৌছাতে হলে বিজ্ঞানীদের, ইঞ্জিনীয়ারদের, ডাক্তারদের পক্ষে প্রয়োজন মজুর ও কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা। মজুরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বিজ্ঞানীরা অসহায় হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, যাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করা উচিত তাদেরই হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হন। এইভাবে তাঁরা জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি বেইমানী করেন।

সমস্ত মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞান যে পথে নিয়োজিত হতে পারে সমস্ত মানুষের চোখের সামনে সেই পথ খুলে ধরতে হবে বিজ্ঞানীকে। এতে তাদের নিজেদেরও উপকার হবে। কারণ যেসব সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সেই সব সমস্যা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করতে হলে ফ্যাক্টরী এবং ফ্যাক্টরীর বাইরে মজুরদের সাথে বিজ্ঞানীদের সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

কিন্তু এই করণীয় কাজগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে সবার পক্ষে জানা দরকার বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষের কি বিপুল কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

বিজ্ঞানের কাছে আমাদের সভ্যতা যে কতখানি ঋণী, ইতিহাস তা বার বার দেখিয়ে দেয়। বিজ্ঞানের জোরে মানুষ রোগের বিরুদ্ধে, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হয়েছে, শৃঙ্খলিত করছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে। কিন্তু বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্তও বিরল নয় ইতিহাসে ……ব্যাপক ধ্বংসের হাতিয়ার হিসাবে এটম বোমার উৎপাদন অন্যতম।

বিজ্ঞানের দুইটি মুখ, একটি কল্যাণের, অপরটি ধ্বংসের। মানুষ তার আবিষ্কারগুলোকে কিভাবে ব্যবহার করে তার উপরেই এটা নির্ভর করে। বিজ্ঞানের এক মুখ দেখে মানুষের মনে জাগে আশা, অন্য মুখ দেখে জাগে আশঙ্কা।

যন্ত্রের উচিত মানুষকে গুরু পরিশ্রমের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া; কিন্তু শোষকের হাতে এই যন্ত্র বেকারত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

একথা ঠিক যে, আজ মানবজাতির সামনে যে সব বিপদ দেখা দিয়েছে তার কারণ, হয় বৈজ্ঞানিক অথবা কারিগরী বিদ্যার অভাব অথবা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।

এই দেখে বিজ্ঞানী কিছুতেই দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না; তাঁর ভাল লাগুক আর নাই লাগুক দায়িত্বের ভার তাঁকে নিতেই হবে। তিনি জানেন বৈজ্ঞানিক পন্থার প্রয়োগ ছাড়া আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রার বড় বড় সমস্যাগুলির সমাধান অসম্ভব। সোভিয়েট ইউনিয়ন, নতুন গণতন্ত্রগুলি এবং চীনদেশ রয়েছে, যারা আমার এ ঘোষণাকে প্রমাণিত করতে পারে।

মানব কল্যাণের জন্য অনেক পরমাশ্চর্য আবিষ্কারের আভাস বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে, কিন্তু এই আভাসকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে সমস্ত সৎ নাগরিকের ইচ্ছা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

প্রথমে ভাবুন ক্যানসার অথবা যক্ষ্মার মত মানুষের এতবড় দুই শত্রুকে যুঝবার জন্য কত কিছু করা যেতে পারে……তারপর ভাবুন প্রকৃতপক্ষে এই দিকে কি করা হচ্ছে। কোনো দেশের অস্ত্র নির্মাণ যেভাবে বাড়ান হচ্ছে তার তুলনায় যে কিছুই হচ্ছে না বললেও কম বলা হয়। কিন্তু ক্যানসার ও যক্ষ্মার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোন্ পথে সাফল্য অর্জন করা যায় বিজ্ঞানীদের আজ তা অজানা নয়। একখানা বড় যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করতে যে খরচ পড়ে তাতে যে শুধু এই দুই রোগের বিরুদ্ধে গবেষণা চালানোর মত দশটি বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়া যায় তাই নয়, ওই দশটি প্রতিষ্ঠান একটা বছর ধরে চালানোর মত লোকজন ও যন্ত্রপাতির খরচ ওই টাকায় হেসে খেলে পুষিয়ে যাবে।

আজ দুনিয়ার মানুষের অধিকাংশই দুর্ভিক্ষের ভয়ে অভিভূত, অথচ প্রচুর শস্য উৎপাদনের মত অবস্থা সৃষ্টির ক্ষমতা আজ বিজ্ঞানের করায়ত্ত। এই উৎপাদন এমন পর্যায়ে উঠতে পারে যাতে যে পরিমাণ জমিতে বর্তমানে চাষ হয় তার একটা অংশেই এত জন্মাতে পারে যা থেকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের পক্ষে যথেষ্ট খাবার হতে পারে। তারপর বাকি জমিটা এমন কতকগুলো উদ্ভিদ্ চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলো থেকে আমাদের জানা মাইক্রোঅরগানিজমের প্রক্রিয়ার সাহায্যে বড় রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজনীয় মূল্যবান মালমসলা পাওয়া

যেতে পারে। অতএব যেসব জমিতে এখন চাষ হচ্ছে সেগুলোকে এমন এক সোনার খনিতে পরিণত করা যেতে পারে যা থেকে এমন সব মালমসলা পাওয়া যাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যার সম্ভাবনা প্রচুর এবং এই সম্পদ কোনদিনই ফুরিয়ে যাবে না, বাড়িয়ে নেওয়া চলবে চিরদিনই।

কিন্তু জীবনের পক্ষে তেজ ও শক্তি দুইয়েরই প্রয়োজন এবং কাজে লাগানো যেতে পারে এমন তেজ যতখানি সম্ভব উৎপাদন করা দরকার।

সমুদ্রের জল সূর্যের রশ্মির দ্বারা বাষ্পে রূপান্তরিত হয় এবং তারই কিছু অংশ পৃথিবীর মাটিতে পড়ে, হাইড্রোইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা থেকে তেজ পাওয়া যায়। কয়লার মত যে সব জিনিস হাজার হাজার বছর ধরে ভূপৃষ্ঠে জমা হয়ে সম্পদে পরিণত হয়েছে তা খরচ না করেও সূর্যের তেজকে বৈদ্যুতিক তেজে পরিণত করা এই বিস্ময়কর আবিষ্কারে সম্ভব হয়েছে। যেখানে সম্ভব সেখানে এই ধরনের যন্ত্রপাতি বসান উচিত।

সমুদ্রের জোয়ারের তাপ শক্তিকে ব্যবহারের সমস্যা সমাধানও আমাদের এইভাবে করা উচিত।

পরমাণুর ভিতর যে তেজ রয়েছে তাকেও বিস্তৃত করতে হবে। অতএব এটম বোমা তৈরি করে মানুষ মারার কাজে যাতে এই তেজের অপপ্রয়োগ না হতে পারে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করা উচিত।

প্রত্যেকটি দুই লক্ষ কিলোওয়াটের কুড়িটা এটম যন্ত্র ফ্রান্সের বিদ্যুত উৎপাদন দ্বিগুণ করবার পক্ষে যথেষ্ট, আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, কুড়িটি যন্ত্র চালু রাখতে হলে বছরে এক গাড়ী তৈরি ইউরেনিয়ামই যথেষ্ট।

সর্বশেষে, বিশেষত, আপনাদের দেশের মত দেশে, যেখানে সূর্যের তেজ, তীব্র সূর্যের যে তাপ-বিকিরণ পৃথিবীতে এসে ঘা দিচ্ছে তা থেকে উৎপন্ন তেজের বিপুল বন্যা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে যে পথে গবেষণা চালান উচিত বিজ্ঞানীরা আজ তা জানেন।

এ কথা আজ বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে, এই সমস্যাগুলির সমাধান যদি করা যায় তাহলে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে আজ যে দৈনন্দিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে তার পরিবর্তে তাকে এমন কিছু সময় বাধ্যতামূলক পরিশ্রম করতে হবে যে সময়টা তার জীবনের একটা সামান্য অংশ মাত্র।

কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে যদি শান্তি বজায় না থাকে তবে এই বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে বাস্তবে পরিণত করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাই মানুষের স্বাধীনতার লড়াই ও শান্তির লড়াই আজ অভিন্ন, মারণাস্ত্র নির্মাণের নীতি যতদিন তার গভর্নমেণ্ট অনুসরণ করে চলবে ততদিন জনসাধারণের কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োগ করা যাবে না!

মজুরেরা কি জানেন যে, যে আট ঘণ্টা তারা মাঠে অথবা কারখানায় কাজ করেন তার চার ঘণ্টা ব্যয় হয় অস্ত্র শস্ত্র ও সৈন্য সামন্তের খরচ জোগাতে অর্থাৎ খরচ হয় এমন কাজে যাতে একেবারেই পণ্য উৎপাদন হয় না। আরও মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই চার ঘণ্টা ব্যয় করা হয় অপর চার ঘণ্টায় যা উৎপন্ন হচ্ছে তাই ধ্বংস করায় প্রস্তুতির জন্য।

কিন্তু যে সব লক্ষ লক্ষ নরনারী বিরাট শান্তি আন্দোলনে আজ সক্রিয় ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তারা এ ব্যাপারটি স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন এবং তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াই তারা বীরত্বের সাথেই চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের লড়াই যে ন্যায়ের লড়াই একথা আমরা এত গম্ভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, কোন প্রকার নির্যাতনে অথবা ভীতি প্রদর্শনে আমাদের টলান যাবে না।

লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞান আজ বিরাট ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছে, তাই বিজ্ঞানীরা, চিকিৎসকেরা, ইঞ্জিনীয়াররা পরম আনন্দের সাথে, পরম বিশ্বাসের সাথে, তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কারণ, আমাদের সামনে এক উজ্জ্বলতর জীবন—আর এ জীবন মৃত্যুর ওপারে নয় এপারেই।

———

গ ল্প

বিচার

প্রকৃতপক্ষে, ভোর হয়েছে বলা যায় না। কৃষ্ণপক্ষের শুরুর দিকের প্রায় আস্ত চাঁদটার আলো ফ্যাকাসে হয়ে এলেও ভোরের আলোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় নি। সূর্যের আলো, চাঁদের গা থেকে ঠিকরে আসা আর সিধে আসা, তফাৎ তো শুধু এইটুকু, তবু কত তফাৎ! ইতিমধ্যেই রাস্তায় জলের কলে লোক জমতে শুরু করেছে। কলে জল আসতে আসতে ছোটখাট ভিড় গড়ে উঠবে। বস্তির মেয়ে পুরুষরাই সংখ্যায় বেশী, বস্তি-ঘেঁষা বাবুদের নতুন কলোনি থেকেও দু'চার জন আসে। কলোনি থেকে রাস্তার কলে নিরুপায় হয়ে ধন্না দিতে আসে শুধু লুঙ্গি পরা গেঞ্জি গায়ে বা গামছা জড়ানো বেপরোয়া জোয়ান পুরুষ আর কোরা অবস্থা থেকে এক বারও ধোপ না দিয়ে মাঝে মাঝে সাবান কাচা করার ফলে পাকা একটা ময়লা রঙের মোটা ছেঁড়া থান পরা মাঝবয়সী বিধবা, যাদের স্তিমিত বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ; মজুর মেয়ে পুরুষ গোড়ার দিকে অদ্ভুত এক ধরনের মায়া বোধ করত।

আজকাল আর করে না। ওরা ভীষণ ঝগড়াটে! লাইনে যায়গা নিয়ে বালতি কলসী ভরে নিয়ম ভেঙ্গে চট করে একটু চানও করে নিতে চেয়ে গলা ছেড়ে কোন্দল করে।

শহরতলীর এই বস্তিবাসী মজুর মজুরনীর চোখের সামনে কয়েক মাসের মধ্যে ভোজবাজির মত প্রায় এক ধাঁচের ছোট ছোট দালানের কলোনিটা গড়ে উঠেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে গোটাকতক কুঁড়ে, তিনটে ডোবা পুকুর, বাঁশ ঝাড়, এবং ছোট একটা মহিষের খাটাল। লোকে বলে রসিকবাবুর কলোনি, কিন্তু আসলে সবাই জানে মারোয়াড়ী ভগবানদাসের টাকাই অবস্থা আঁচ করে ডোবা ভরিয়ে বাঁশঝাড়, কচুবন, কুঁড়ে, খাটাল উচ্ছেদ করে সস্তা ওঁচা ইট সুরকি সিমেণ্ট ইত্যাদি দিয়ে নীচু ভিতে রপ্ত করা দালানগুলি তুলেছে—পূর্ববঙ্গের একশ্রেণীর গৃহত্যাগী ও গৃহের জন্য উন্মাদ মানুষের ঘাড়

ভেঙ্গে মোটা মুনাফা লুটেছে। এরা ধনী নয়ত অবস্থাপন্ন জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, চাকুরে—দশ বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাড়ীর মালিক হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসাটাই ছিল এদের প্রথম স্বপ্ন, প্রথম প্রয়োজন। অধিকাংশই আবার বাড়ীর একাংশে ভাড়াটে বসিয়েছে, অন্তত একখানা ঘরে, কিছু আয়ের জন্য। ভাড়াটেরা অল্প সঞ্চয় নিয়ে আগত রিফুইজি বা সাধারণ চাকুরে।

এই কলোনির বিপরীত দিকে রাস্তার ওপারে এক টুকরো প'ড়ো জমিতে আরেকটা কলোনি গড়েছে—পুতুলের খেলা ঘরের মত কয়েকটা হোগলার চালা উঠেছে, প্রায় মানুষের মাথা সমান উঁচু, লম্বা হয়ে শোয়া যায় প্রায় এরকম লম্বা, তিনচার জন পাশাপাশি শোয়া চলে প্রায় এতখানি চওড়া। এটা তাদের কলোনি, বন্যার কুটার মত দলে দলে যারা ভেসে এসে চারিদিকে সর্বত্র আটকে গেছে, বস্তিতে, রোয়াকে, রাস্তায়, গাছতলায়।

ভোরের আলো প্রকট হতে থাকে, জলের উমেদারদের লাইন বড় হতে থাকে। খানিক দূরে রাস্তার ওপারে হাইড্রাণ্টের চুয়ানো জল লোটায় ভরে স্নান চলছে। বস্তির কাছে ছোট পুকুরটার জল সবুজ হয়ে গেঁজিয়ে উঠেছে, তার চেয়ে এই কাদাগোলা নদীর জল অনেক শুদ্ধ ও পরিষ্কার। রাত্রে একদমক ঝড়ের সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, ভোরটা ঠাণ্ডা ও মিষ্টি হয়ে আছে—খালি গাগুলিতে। আকাশে সাদাটে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ দ্রুত উত্তরে পাড়ি দিচ্ছে, চাঁদটা ছুটেছে বিপরীত দিকে। চারিদিকে কাছে ও দূরে এলোমেলো ভাবে ওই আকাশের দিকে উঁচিয়ে আছে কারখানার চিমনি। ওগুলির তুলনায় রাস্তায় জলের কলের নলটা কত সরু! ওই চিমনির কোন কোনটা হাজার মানুষকে খাটিয়ে রক্ত-মাংস, আনন্দ, অবসর শুষতে ধোঁয়া ছাড়ে, কিন্তু সারা এলাকায় যতগুলি চিমনি রাস্তায় বস্তিতে ততগুলি জলের কলও বুঝি নেই। উপোসী মানুষের জলের তেষ্টাও মেটে না, মুখ দিয়ে জল গিলে খাবার তেষ্টাটুকু ছাড়া সর্বাঙ্গের যে শতরকম তেষ্টা আছে, কাপড়গামছা বাসনপত্র ভালভাবে ধুয়ে মেজে সাফ করার যে দরকারী সাধ আছে।

দাঁতন ঘষতে ঘষতে মতিলাল বস্তি থেকে বেরিয়ে এসে জলের কলে লাইন আর হাইড্রাণ্টের চুঁয়ানো জলে স্নানের চেষ্টা দেখে থুতু ফেলে আকাশের দিকে চেয়ে।—যেন ওই উঁচানো চিমনিগুলিকেই একটা অশ্রাব্য গাল দেয়।

মানুষটা যে ঢ্যাঙা, চওড়া বুকের পাঁজরগুলি ঠেলে উঠেছে, মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি, কিন্তু মাথায় বড় টাক, টাকের বাড় ঠেকাতেই যেন কদমছাঁটা কাঁচা পাকা চুলের বাঁধ দিয়েছে টাটকা ঘিরে।

মতিলালের হাতে ছিল ঘরে লোহার শিক বাঁকিয়ে তৈরী করা নকল চাবি, খানিক ধস্তাধস্তি করে সে হাইড্রাণ্টের মুখটা খুলে দেয়। হাতের তালু দিয়ে হাইড্রাণ্টের মুখ চেপে সরু ধারায় জল তুলে ধীরে ধীরে লোটা ভরে রামসুখ স্নান করছিল। পা দিয়ে চেপে মতিলাল তোড়ে জলের তিনহাত উঁচু বাঁকা ফোয়ারা তুলে দেয়, রামসুখ এবার মনের সুখে দাঁড়িয়ে স্নান করে, গা ঘষে ময়লা গামছা দিয়ে।

স্নানার্থী একজন বলে, আরে রাম রাম, রামসুখ!

তেওয়ারী ব্রাহ্মণ রামসুখ নীচু জাতের একজনের পা-ধোয়া জলে স্নান করছে— মন্ত্র পড়তে পড়তে স্নান করছে—বেচারার কাঁচা শহুরে প্রাণটাকে এটা নাড়া দিয়েছে ভীষণভাবে। মানুষটা মেটে রঙের, মাঝবয়সী, কপালে গতকালের চল্‌টা ওঠা চন্দন-তিলকের চিহ্ন, কব্জিতে গোটাতিনেক মাদুলি, নেড়া মাথায় টিকি থেকে ফুলটা খসে পড়ে গেছে কিন্তু গিঁটটা আছে। পরনের নতুন আধখানা হেঁটো কাপড়টি কয়লার গুঁড়োয় কুচকুচে কালো। মতিলালও এ ভাবেই কাপড় পরে। একখানা কাপড় কিনে দু'খণ্ড করে চালায়—কাপড়ের যা দাম!

মাত্র ক'মাস আগে দেশ থেকে চাষবাস ছেড়ে কলকাতায় এসেছে শিউশরণ,—সেও ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ হৃদয়টি তার এই ক'মাসে কতবার কত ভাবে যে বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম করেছে, কিন্তু বিদীর্ণ হয় নি। কারণ তার হৃদয়টাই ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখার চেয়ে প্রাণটা বজায় রাখা পছন্দ করেছে অনেক বেশী।

অভয়পদ দাসের স্থানীয় ছোট কয়লার গুদোমটিতে সে কুলি খাটে,— মফতে! লরী ভরে চালান এলে কয়লা নামায়, খদ্দের এলে কয়লা মেপে দেয়—পাঁচ সের থেকে একমণ পর্যন্ত এক একবারের মাপ। এক মজুরি পায় না, পায় দু'বেলা আধপো হিসাবে আটা, ছটাকখানেক তরকারী আর দু'টি করে কাঁচা লঙ্কা। তার রেশন কার্ডের চিনি আর চাল অভয়পদর বাড়ীতে যায়। সকালে বিকালে ফাউ পায় শিউশরণ—দু'পয়সার

ছাতু বা ছোলা। ভোর থেকে রাত আটটা নটা পর্যন্ত কয়লার গুদোমে তার এলোমেলো ছাড়াছাড়া ডিউটি।

বাড়তি খেটে তার রোজগার। পাঁচ দশ সের কয়লা যারা কেনে তারা নিজেরাই কাঁধে বয়ে নিয়ে যায়। আধমণ একমণ কয়লার বস্তা খদ্দেরের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সে মজুরি পায় দু'আনা। বাঁধা রেট—খদ্দেরের বাড়ী একমিনিট বা দশমিনিট দূরে হোক।

রামসুখ তার তিরস্কার শুনেও শোনে না বলে শিউশরণ ভীষণ রেগে আবার বলে, রাম রাম রামসুখ!

তার ধিক্কার শুনতে শুনতে রামসুখ নির্বিচারে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে সরে দাঁড়িয়ে গা মুছতে থাকে। এমন সে স্বার্থপর নয় যে তোড়ে জল পেয়েছে বলেই অন্য সকলের স্নান ঠেকিয়ে নিজে সাধ মিটিয়ে স্নান করে যাবে,—যদিও সে জানে আরও দু' তিন মিনিট জলের ফোয়ারাটা সে দখল করে থাকলেও কেউ কিছু বলত না বা ভাবত না।

রামসুখের বদলে মতিলাল এবার ধমকের সুরে শিউশরণকে বলে, পাগলা হো গিয়া? গঙ্গাজল আছে না?

রামসুখ মতিলালের দিকে আড় চোখে চেয়ে মুচকে হাসে। মতিলাল না হেসেই চোখের ইঙ্গিতে সায় দেয়। তারা দু'জন কারখানার ঘাগী মজুর, বুঝে নিয়েছে বেচারা শিউশরণের মুস্কিল।

ও, হাঁ, ঠিক বাত!

শিউশরণ যেন মুক্তি পায়, ইংরেজ রাজের জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার চেয়ে বড় মুক্তি। এতই সে সস্তি আর আশ্বাস বোধ করে যে অল্পবয়সী মুসলমান ছোকরাটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মতিলালের পা ধোয়া কাদা-গোলা গঙ্গাজলের ফোয়ারায় স্নান করতে লেগে যায়! মনে হয়, মতিলালের পায়ের চাপে হাইড্রাণ্ট থেকে বাঁকা হয়ে যে জলের ফোয়ারা উঠেছে সেটা তার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে কোমরে গলায় সাপ জড়ানো, মোমের রক্তহীন পুতুলের মত আকাট ফর্সা, কোলে পুতুলের মত ছোটখাট একটি মেয়ে বসানো, বটতলার সস্তা শিবের ছবির সাপে বাঁধা জটা থেকে উৎসারিত জলের ফোয়ারাকে!

কিন্তু পাওয়া তার এত সহজে হয় না। রামসুখ ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়, গর্জন করে বলে, লাটসাহেবী জজ ম্যাজিষ্টারি চালাবে না হেথা,

খপর্দার! একজন যে নাইছে তাকে নাইতে দিয়ে তবে তুমি আসবে।

ক্রুদ্ধ শিউশরণ রুখে উঠে বলে, আমি পয়লা এসেছি।

—না, তুমি পয়লা আসো নি। তোমার আগে সালেক এসেছে।

—হাঁ? তুমি বললেই হয়ে গেল? একে জিজ্ঞেস কর।

পীতাম্বর খাবারের দোকানে কাজ করে, একপাশে বসে সে কড়াই মাজছিল। সাক্ষী মানায় শিউশরণকে সমর্থন করে সে বলে যে হাঁা, সালেকের আগেই শিউশরণ এসেছিল বটে।

ঝগড়া করছ কেন? একে একে নেয়ে নাও না!

কিন্তু তা কি হয়! তোড়ে জল উঠেছে, ঝগড়ার মীমাংসা হতে হতে সালেকের স্নান হয়ে যাবে কিন্তু সে হল ভিন্ন কথা। আপসে একজন কেন দশজন তার আগে নেয়ে নিক, সে কিছু বলবে না। অন্যায় সহ্য করবে কেন, অবিচার মানবে কেন! যতই সামান্য হোক সে অন্যায়, অবিচার।

রামসুখ বলে, আরে বাবা, তোমাদের দু'জনারই আগে সালেক এসেছিল। কল খোলার চাবিটা তো চাই? না, চাই না? চাবি আনতে সালেককে মতিলালের ঘরে ভেজেছিলাম। ভেবেছিলাম কি, মতিলাল আজ ভোরে চান করতে আসবে না।

মতিলাল বলে, হাঁা, চাবি চাইতে গিয়েছিল। একসাথে আসছিলাম, দাঁতন খুঁজতে পিছিয়ে গেল।

তা হলে অবশ্য কোন কথা নেই। পরে এসে তাকে ডিঙ্গিয়ে নাইতে শুরু করেছিল ভেবেই সে সালেককে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল, সালেক যদি সত্যই আগে এসে থাকে তবে কাজটা তার অন্যায় হয়েছে বৈকি, তাকে ধাক্কা দিয়ে ধমক দিয়ে রামসুখ দোষ করে নি। মেঘ সরে গিয়ে যে ভাবে সূর্য বেরিয়ে আসে, তেমনিভাবে, পলকে পলকে শিউশরণের মুখের ক্রুদ্ধভাব কেটে যায়।

রামসুখ মতিলালকে জিজ্ঞাসা করে, ভোরে চান করলে কেন আজ?

মতিলাল আশ্চর্য হয়ে বলে, খাটতে যাব না?

—খাটতে যাবে? আজ?

আজ বিশ বছর ধরে মতিলাল কারখানায় খাটতে যাচ্ছে, আ

কারখানার ছুটি বা ধর্মঘট বা শহরে হরতাল এসব কিছুই নেই, তবু মতিলাল আজ কাজ করতে যাবে শুনে রামসুখ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার মুখ দেখে মতিলালেরও ভাবনা লেগে যায় যে তার অজান্তেই হয়ত বা মস্ত ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে যেজন্য আজ কাজে যাওয়াটা খুবই খাপছাড়া হবে।

—কি ব্যাপার রামসুখ? কি বলছ? আজ কাজে যাব না কেন?

—কোর্টে যাবে না? কাজে যাবে তো কোর্টে যাবে কি করে?

এবার মতিলালের মুখের ভাব কঠিন হয়ে যায়।

—কোর্টে যাব? কোর্টে যাবার আমার দরকার কি?

—তোমার ছেলেকে হাজির করবে না আজ?

মতিলাল মাটিতে থুতু ফেলে দারুণ অবজ্ঞার সুরে বলে, হাঃ, কত হাজির করছে!

দাঁতনটা দাঁতে চিরে মতিলাল জিভ চাঁছে, মুখ ধোয়। একটা ফাঁকা লরী জোরে বেরিয়ে যায়। রামসুখ দ্বিধাভরে খানিকটা যেন জিজ্ঞাসার সুরেই বলে, তবু একটা হুকুম যখন হয়েছে—

হুকুম হয়েছে, তোমার শখ থাকে তুমি যাও! মিছিমিছি একটা দিনের মজুরি যাবে, বাসভাড়া যাবে, অত গরজ আমার নেই!

মতিলালের দ্বিধা নেই, সংশয় নেই. বিচারক হুকুম দিলেও তার আটক ছেলে ও সাথীদের বিচারালয়ে হাজির করা হবে, সে বিশ্বাস করে না! বিনা বিচারে আটক বাতিল হবে না, এটা জানাই গেছে। কিন্তু বন্দীদের বিচারালয়ে হাজির করা হবে, এতেও মতিলালের এমন সুনিশ্চিত অবিশ্বাস যে একদিনের মজুরি ও বাসের পয়সা খরচ করে গিয়ে যাচাই করে আসতেও সে রাজী নয়।

জলের কলের লাইন থেকে একজন চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে, মতিলাল! কোর্টে যাবে তো?

মতিলাল চেঁচিয়ে জবাব দেয়, না!

তার জবাব শুনে কয়েকজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক লাইন ছেড়ে এদিকে এগিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে বোঝা যায় মতিলালের জবাব তাদেরও রামসুখের মতই বিচলিত করে দিয়েছে।

কাছে এসে দু'তিন জন একসঙ্গে প্রশ্ন করে : যাবে না কি রকম ? তারিখ পাল্টেছে ? বিচার বাতিল হয়ে গেছে ?

আরেকজন প্রশ্ন করে, তোমার ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে ?

এই প্রশ্ন শুনে মতিলাল জ্বালা ও ব্যঙ্গভরা এক অদ্ভুত সশব্দ হাসি হাসে—ছেড়ে দিয়েছে বৈকি, ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করাতে হাওয়াই জাহাজে মার্কিন মুলুকে পাঠিয়েছে।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্নকারীকে বলে, আমার ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে, তবে আর ভাবনা কি, আর কে শালা কোর্টে যায়,—তাই কোর্টে যাব না ভাবছ বুঝি ?

প্রশ্নকারী লজ্জা পায়, তাড়াতাড়ি বলে, না না, তা ভাবি নি, তা ভাবব কেন ! কথাটা মনে হল তাই—

আরেকজন বলে, যাক যাক্, যেতে দাও। ব্যাপারটা কি মতিলাল ? যাবে না কেন ? আমি তো ভাবছিলাম যাব, দেখে আসব কি হয়।

মতিলাল বলে, ব্যাপার কি আবার, ব্যাপার কিছু নেই। কিছুই হবে না জানি তো ফের গিয়ে কি করব ? শুধু আইনের মারপ্যাচ নিয়ে কচকচি হবে খানিক, কানাকড়ি মানেও ঢুকবে না মাথায়। কাজ কি বাবা ঝকমারিতে !

—কি করে জানলে তোমার ছেলেদের আনবে না ?

—কি করে আনবে ? সাহস পাবে কোথা ? কি তাদের দরকারটা আনবার ? কোর্টে যদি আনবে, বিচার যদি করবে, বিনা বিচারের কানুন করেছে কি সখের জন্য, ধুয়ে জল খাবে বলে ?

সবাই নির্বাক হয়ে শোনে, শুনেও নির্বাক হয়ে থাকে। তোড়ে জল বেরিয়ে নালা বেয়ে গড়িয়ে যায়, স্নানটা সেরে নিতে শিউশরণেরও খেয়াল থাকে না।

প্রায় ষাট বয়সের বুড়ো পটল প্রথম কথা বলে। বাঁধা সুতোটার কাছ পর্যন্ত পোড়া বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে, দু'বার কেশে, ধীর স্বরে সে বলে, আমি বলি কি, আইন মতে সমনটমন বেরিয়েছে, ওদেরই জজ-আদালত, ওদেরই নিয়মকানুন, তাই হয় তো বা—

মতিলাল হেসে বলে, কোথায় আছ দাদা ? ভাবচো বুঝি ইংরেজ আমল শেষ হয়ে গেছে, সত্যযুগ এসে গেছে ? আগে ঘাড়ে ছিল শুধু ইংরেজ, এখন ইংরেজ মার্কিন ডবল ভূতের পালা। যার সৈন্য যার পুলিশ, তার

আইন তার বিচার। নিজের আইনের ফাঁদে পড়লে, জজ আদালতের রায় মুস্কিল করলে, কাল ফের একটা নতুন আইন করে জজ আদালত তুলে দিতেই বা কতক্ষণ !

কড়াই মাজা বন্ধ রেখে পীতাম্বর শুনছিল, সে বলে যা বলেছ মাইরি। লোকে বলে, ভদ্দরলোকের এক কথা ! এ কেমন এক কথা রে বাবু ভদ্দর-লোকের ! এদিকে বিচারও রইবে, বিচার ছাড়া আটকের আইনও রইবে ! রাখবি তো একটা রাখ, খুশী হয় বিচার টিচার সব তুলে দে। বিচার রইলে বিনা বিচার রয় কোন্ বিচারে ?

মতিলাল বলে, ইংরেজ মার্কিনের লেজ ধরে স্বাধীন হলে সবই হয়, এ বাবা মার্কিনী বিচার।—এ শিউশরণ, তোমার তো ভাই টাইমের কাজ নয়, আমি আগে নেয়ে নি ?

—হাঁ, হাঁ।

মতিলাল নাইতে শুরু করে। জলের কলের লাইন থেকে যারা এসে-ছিল তারা ফিরে যায়।

স্নান শেষ হতে হতে মতিলাল টের পায়, জলের কলের লাইনে একটা গোল বেধেছে। চেঁচামেচি তার কানে আসে। লক্ষ্মীর মা কজনের সঙ্গে লাইন ছেড়ে তার সঙ্গে কথা কইতে এসেছিল, লক্ষ্মীর মার পরিচিত তীক্ষ্ণ ও চড়া গলার আওয়াজ তার কানে আসে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাছে গিয়ে দেখে, লাইন ছেড়ে যারা তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গেই লাইনের অন্য কয়েকজনের ঝগড়া বেধেছে।

লাইনের যেখান থেকে যে দু'মিনিটের জন্য সরে গিয়েছিল ফিরে এসে এবার আবার সেইখানে দাঁড়াতে চায় কিন্তু কয়েকজন তাদের এ দাবি মানতে রাজী নয়। তারা বলছে, এদের দাঁড়াতে হবে সকলের পিছনে।

কারণ, তাই নিয়ম, জলার্থীদের রাস্তায় দাঁড়ানো পার্লামেন্টের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইন।

অনেকটা মতিলালের চেষ্টাতেই আইনটা পাশ হয়েছিল। শুধু লাইনে দাঁড়ানোর নিয়ম নয়, অন্যান্য ধারায় একজন ক'বালতি জল পাবে, কখন খাবার জল নেওয়া ছাড়া মুখ হাত ধোয়া পর্যন্ত চলবে না কখন চলবে, এসব

বিষয়েও নিয়ম ঠিক করা হয়েছে, সকলে স্বীকার করেছে নিয়ম মেনে চলবে। নানা অবস্থার নানা বয়সের লোক এসে কলে ভিড় করত, বস্তি থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ দোকানপাট ঘরবাড়ীর আনাচ কানাচ রিফুইজিতে ভরে যাবার পর ভিড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, বিশেষ করে এই ভোরের দিকে। প্রতিদিন হাতাহাতির উপক্রম হত, ছোটখাট মারামারি বেধেও যেত প্রায়ই। ভোরে বেশী মজুর হাজির থাকায় মারামারিটা গড়াত না, অল্পেই থেমে যেত। মতিলাল একদিন সকলের জন্য একরকম নিয়ম চালু করার কথা বলে, কলোনির ফকিরবাবু খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বালতি কলসী বসিয়ে রেখে, এমন কি আগের রাত্রে ভাঙ্গা মাটির কলসী বসিয়ে লাইনে যায়গা দখল করে রাখা নিয়েই ঝগড়া হত সব চেয়ে বেশী। তাই নিয়ম হয়, লাইনে যে হাজির থাকবে তারই জল নেবার অধিকার, বালতি কলসীর নয়। লাইন ছেড়ে চলে গেলে ফিরে এসে সকলের পিছনে দাঁড়াতে হবে।

এই নিয়মের বাখ্যা আর প্রয়োগ নিয়ে আজ গোল বেধেছে।

আরেকটা নিয়ম হয়েছিল, ভোরে একজন এক বালতি বা এক কলসীর বেশী জল পাবে না, সাতটার পর দু'বালতি বা দু'কলসী। ফকিরবাবু নিয়ম করার সময় খুব লাফিয়েছিল, পরদিন সে পাঁচটি বাচ্চা, দু'টি বড় কলসী আর চারটি বড় বালতি নিয়ে হাজির—বোধ হয় প্রতিবেশীর কাছে ধার করে: বাচ্চাগুলি তার নিজের।

ঝগড়া আরম্ভ করেছিল লক্ষ্মী, সকলে তার পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু ফকিরবাবু কিছুতে মানবে না সে নিয়ম ভেঙ্গেছে। একজনের এক বালতি— সে তো বেশী চাইছে না। বাচ্চারা কি মানুষ নয়!

অন্য কয়েকজনও ছেলে মেয়ে সাথে এনেছিল কিন্তু ফকিরবাবুর মত এতটা চালাক হতে কেউ পেরে ওঠে নি। তখন নিয়ম হয়, প্রত্যেকের জন্য এক বালতি বটে কিন্তু সে এমন বালতি হবে যা নিজে বইতে পারে। ফকিরবাবু হম্বি তম্বি করেছিল অনেক কিন্তু সকলে মিলে যে নিয়ম করেছে তা না মেনে উপায় কি। কলোনির দু' তিনজন ভদ্রলোকও তার বিপক্ষে দাঁড়ায়।

আজও ফকিরবাবুই চেঁচাচ্ছে বেশী।

—যা নিয়ম আছে তা মানতে হবে। তোমরা কোন লাটসায়েব যে

খুশীমত নিয়ম ভাঙ্গবে? চলবে না ওসব, পিছনে দাঁড়াতে হবে তোমাদের সবার পিছনে।

লক্ষ্মী আকাশ-চেরা গলা শেষ পর্দায় তুলে বলে, আরে মরণ মোর! নিয়ম ভাঙ্গলাম কিসে? দু'পা গিয়ে দু'দণ্ড একটা লোকের সাথে কথা কয়েছি, তাতে লাইন ছেড়ে যাওয়া হল কোনখানটায়? একটা লোকের জোয়ান ছেলেটা কতকাল বিনা বিচারে আটক রয়েছে, আজ নাকি তার বিচার হবে সবার সাথে, বাপটাকে দেখে দুটো কথা শুধিয়ে না এসে থাকতে পারে মানুষ? তাতেই লাইন ছাড়া হল! এ কোন দেশী বিচার গো মা! তুমি যে নর্দমায় জল করতে যাও, সেটা লাইন ছাড়া হয় না কেন? পিছনে দাঁড়াও না কেন জল করে এসে?

মতিলাল কাছে এলে লক্ষ্মী বলে, ও মতিলাল একটা বিচার কর!

ফকিরবাবু বলে, মতিলাল আবার কি বিচার করবে! বিচারের কি আছে! লাইন ছেড়ে গেলে পিছনে দাঁড়াতে হবে, সোজা কথা!

কিন্তু মতিলালকে এত সহজে বাতিল করা সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ যারা চুপ করে ঝগড়া শুনছিল, বুঝে উঠতে পারছিল না কোন পক্ষের যুক্তি সার্থক, তারা বলে, না না, মতিলাল কি বলে শোনা যাক।

দেখা যায়, যারা ফকিরবাবুকে সমর্থন করেছে তাদের মধ্যেও কয়েকজন মতিলালের কথা শুনতে ইচ্ছুক।

মতিলাল গামছা দিয়ে মুখ মুছে ফকিরবাবুর দিকে চেয়ে বলে, মোরা হেথা বেশীর ভাগ গরীব মানুষ বাবু, খেটে খাই।

মতিলাল একটু থামে। সকলে চুপ করে শোনে। কলে জল এসেছে, তলে বসানো বালতিতে জল পড়ার শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়।

মতিলাল বলে, মোরা এঁটো কথা গিলি না বাবু, বমি করে খাই না।

সে আবার একটু থামে। বোঝা যায়, ফকিরবাবু বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করছে। মতিলাল তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনে।

বলে, মোরা দশজনে মিলে নিয়ম করেছি, নিয়মটা মোদের মানতে হবে। কেউ তো খুশিমত নিয়ম মোদের ঘাড়ে চাপায় নি, মোদের কি বলার আছে কানে না তুলেই। তোমাদের কিন্তু লক্ষ্মী পিছনে দাঁড়ানো উচিত। মোদের নিয়ম মোরাই যদি না মানি তো মানবে কে'।

লক্ষ্মী নরম স্বরে মৃদু প্রতিবাদ জানায়, বিনা বিচারে আটকের বিচারটা কি ব্যাপার একটু জানতে গেলাম—

মতিলাল মাথা নেড়ে বলে, তা বললে চলবে কেন! লাইন ছেড়ে না গেলেই হত, আমি এখান দিয়ে যাবার সময় শুধোতে পারতে, ঘরে গিয়ে জানতে পারতে। জরুরী বলে যদি লাইন ছেড়ে না গিয়ে পার নি, তার দামটুকু দিতে হবে না?

বুড়ো পটল বলে, ঠিক কথা!

বলে সে বালতি হাতে লম্বা লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য পা বাড়িয়েছে, জোয়ান বয়সী খলিল তার হাত ধরে লাইনে নিজের যায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

বলে, আমার তাড়া নেই, পিছনে যাচ্ছি। বুড়ো মানুষ, তোমার কষ্ট হবে।

খলিলের জল পাবার পালা আসতে বাকী ছিল চারজন।

লাইনের মাঝামাঝি দাঁড়ানো সুখী ডেকে বলে, অ লক্ষ্মীদিদি, তুমি বরং মোর যায়গায় এসে দাঁড়াও। মেয়েটার জ্বর কমে নি, না?

যারা মতিলালের সঙ্গে কথা কইতে লাইন ছেড়েছিল তাদের উদ্দেশ করে সাধারণভাবে আরেকজন বলে, তোমাদের কারো যদি তাড়া থাকে ভাই—

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প

তিনজন

আমরা কয়েকজন প্রায় একই সঙ্গে কোলকাতা বন্দরে কাজে ঢুকেছিলাম। তখন সবে যুদ্ধ শুরু হ'য়েছে। কেষ্টো মহাপাত্র আর পরসাদী ধারকার ছিল একনম্বর গ্যাংয়ের মাহিনাওয়ালা (মাস মাহিনা করা) কুলি। ইসমাইল ক্রেন খালাশীর কাজ পেয়েছিল।

মজুরদের প্রায় সবাই বিহার আর যুক্ত প্রদেশের বিভিন্ন গ্রামের লোক। একমাত্র কেষ্টো এসেছিল উড়িষ্যা থেকে আর ইসমাইলের বাড়ী বাংলাদেশে।

এখানকার সমস্ত মজুরের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে পুরনো। সে জন্যে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা ছিল গভীর। ইসমাইলের সঙ্গে আমাদের খাতির হয়েছিল পরসাদীর মারফত। ওর সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল পরসাদীর।

ওদের মধ্যে আস্তে আস্তে এমন ভালবাসা গড়ে উঠলো যে শেষ পর্যন্ত তিনজনই গিয়ে বাসা ভাড়া করল হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায়। ভাষা, ধর্ম বা জাতের তফাত কোন কিছুই এই বন্ধুত্বের বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় নি। অবশ্য মজুরদের মধ্যে এমনিই যথেষ্ট বন্ধুত্ব থাকে কিন্তু ওদের বেলায় তার উপরেও অন্য কারণ ছিল।

সমস্ত মজুরের মধ্যে ওদের তিনজনের চালচলন একটু অন্য ধরনের। পরিষ্কার জামা পরা, কাপড়ের বদলে প্যান্ট পরা কিংবা কথা বলার মধ্যে কিছুটা চোস্ত ভাষা ব্যবহার করা—এসবই ছিল লক্ষ্য করার মত। এমনকি ইসমাইলের একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত ছিল।

সাধারণ মজুরদের সঙ্গে ওদের তফাতটা বেশ নজরে পড়ে। আমাদের দেশ থেকে কখনও কখনও আত্মীয়স্বজন আসে জাহাজ দেখতে। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, চাল-চলন কিংবা কথা বলার ঢং দেখে সমস্ত মজুররাই মনে মনে হাসে। কারণ তার মধ্যে অনেকখানি আনাড়ি ভাব প্রকাশ পায় এবং তাদের তুলনায় আমাদের গুদামের মধ্যে সবচেয়ে বোকা মজুরও

দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে কিংবা জাহাজ সম্বন্ধে অনেক বেশী খবর রাখে। ওদের তিনজনের সঙ্গেও সাধারণ মজুরদের তফাত ঠিক প্রায় ততখানিই।

এই যেমন ছুত-অচ্ছুতের ব্যাপারটাই ধরুন। গ্রামের তুলনায় কম হলেও সেটা এখনও খানিকটা আছে। মজুরদের চেয়ে সেটা আবার সারেঙ্গ টিণ্ডালদের মধ্যে বেশী। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বামুন, ছত্রি। এঁরা গ্রামের সমস্ত ব্যবস্থাকেই টিঁকিয়ে রাখতে চান, অবশ্য শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেন না। মজুরদের মধ্যে যারা এই ছোঁয়াছুঁয়ি দোষ মানে না তার ভেতর ওরা তিনজন হ'চ্ছে সবচেয়ে পুরনো। যারা মানে তারাও ওদের সামনে সে কথা বলতে ভয় পায়। আস্তে আস্তে না মানার দলটাই প্রবল হয়ে উঠছে। এ জন্যে সারেঙ্গ টিণ্ডালদের ক্ষোভের অন্ত নেই। ওদের তিনজনকেও তারা অচ্ছুত বলেই মনে করে। নিজেদের মধ্যে যাই হোক শেষ পর্যন্ত "আমরা সবাই ভারতের লোক" এমনি নানারকমের যুক্তি দিয়ে এই ব্যবস্থা অনেকেই মেনে নিচ্ছে কিন্তু ভারতের বাইরের লোকের হাতে এতদিন পর্যন্ত কিছু কেউ খায় নি। কিন্তু তাও একদিন ভেঙ্গে গেল। সেদিন একটা চীনা জাহাজ লেগেছিল জেটিতে। রাতে প্রত্যেক জাহাজী টালি-ক্লার্কদের কফি খেতে দেয় ওরা। যে কদিন ওরা এখানে থাকে সবার সঙ্গে হাসি তামাসা করে, সিগারেট, কফি খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করে। বাঙ্গালী বাবুরা খায় কিন্তু মজুররা ছোঁয় না। তার কারণ, মজুররা মনে করে চীনারা অচ্ছুৎ। সারেঙ্গ টিণ্ডালরা বলে যে চীনারা আর্শোলা, টিকটিকি খায়। কথাটা খানিক খানিক বিশ্বাস করে মজুররা। হাজার হ'লেও তো সারেঙ্গ টিণ্ডালরা অনেকেই মাইনর পাশ। তুলসী দাসী রামায়ণের দু'একটা শ্লোক মুখস্থ বলে কিংবা মালের উপর ইংরেজিতে ছাপা মার্কা পড়তে পারে...সুতরাং এ খবরটা তারা জানতেও পারে। যা হোক অন্যদিনকার মত সেদিনও জাহাজের বাবুর্চী কফি খাওয়ার জন্যে মজুরদের সাধাসাধি করছিল। হটাৎ কেষ্টো এক বাটি কফি নিয়ে চুমুক দিলে। বাস, আর যাবে কোথায়? হৈ চৈ পড়ে গেল সমস্ত গুদামে, হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এলো সারেঙ্গরা। রামআধার পাণ্ডে বললো "কিরে কেষ্টো জাত ধর্ম তোর কিছু নেই না কি? এই অচ্ছুতদের কফি স্বচ্ছন্দে খেলি তুই? জানিস ওরা টিকটিকি খায়?"

"খায় তো কি হবে? আমরাও তো পাঠা খাই। যার যার খাবার জিনিস সে খায়। বাটীতে কি টিকটিকি লেগে আছে?" কেষ্টো জবাব দিলো।

মজুররা চারদিকে গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়ালো। কেষ্টোর যুক্তিটা খানিকটা লাগে তাদের মনে। পরসাদীও কেষ্টোর সমর্থনে বলে।

"আরে সারেঙ্গ তুমি যেদিন প্রথম দেহাত থেকে শহরে এসেছিলে সেদিন মিঠাইয়ের দোকানে রসগোল্লা আর পুরি একসঙ্গে দেখে খাবার পর গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করেছিলে—কলের জল না খেয়ে চাপা কলের জল খেয়েছিলে আর আজ তুমি যে কোন দোকানের চা খাচ্ছ কই এখন তো বমি করি না? ও সব জমানা চলা গিয়া—"।

বেকায়দা দেখে সারেঙ্গ আস্তে আস্তে সরে পড়লো। কোলকাতায় এসে অনেকেই গোপনে অনেক নিয়ম ভঙ্গ করে ফেলেছে, পরসাদীর জয়ে যেন সকলেরই জয় হল। অনেকেই মনের কথাটা আস্তে আস্তে আলোচনা করতে শুরু করে।

এমনি ধরনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের ধারা পাল্টে যাচ্ছিল আর তার ভিতর অনেকগুলোরই গোড়াপত্তন করেছিল ওরা তিনজন। অবশ্য ওদেরও আগে আমাদের গুদামের হিমাংশু বাবু নামে এক বাঙ্গালী বাবু ছিলেন—তিনি আমাদের মধ্যে এই সব অভ্যাসের সমালোচনা করতেন। শুধু তাই নয় আমাদের উপরে নানা রকম জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতেন। সাধারণত, বাবুরা তখনও আমাদের সঙ্গে বড় একটা মিশতো না। কিন্তু ঐ বাবুটি খুব মিশতেন, আমাদের দরখাস্ত লিখে দিতেন আর আমাদের ইউনিয়ন গড়ার কাজে তিনি ছিলেন একজন প্রধান উৎসাহী।

আমাদের গুদামের দক্ষিণ দিকের ঠেলা গাড়ীর উপর তিনি বসে থাকতেন। মজুররা কেউ বা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করত কেউ বা দরখাস্ত লেখাতো। ইসমাইল, পরসাদী আর কেষ্টো বেশীর ভাগ সময়ই থাকতো ওখানে। সেই বাবুটির কাছ থেকে ওরা অনেক গুণ জ্ঞান পেয়েছে। বলতে কি ওরা তিনজন যেন তাঁর হাতে গড়া। বছর খানেক হলো তাকে সরকার বন্দী করে রেখেছে।

তারপর থেকে ওরা তিন্‌জন আমাদের চোখে আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত কাজেই ওরা এসে আগে দাঁড়ায়। ওদের নকল করার জন্যে অনেকেই আমরা চেষ্টা করি। এতদিন পর্যন্ত আমরা সারেঙ্গ টিণ্ডালদের কথাতেই চলতাম—কিন্তু সেটা ভয়ে, আর আজকাল চলি ওদের উপদেশে—এটা ভালবাসায়।

আমাদের রাত ডিউটি শেষ হ'তে আর একদিন মাত্র বাকি ছিল। কাজ কর্ম খুবই কমে গেছে আজকাল। দশ পনর দিন বাদে হয়তো একখানা জাহাজ সামান্য কিছু মাল নিয়ে আসে। এর কারণ কি তা কেউ বুঝতে পারে না। কেউ বলে সরকার বাইরের মাল আসতে দিচ্ছে না, কেউ বলে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা খারাপ। বাবু মজুর সবাই দিনরাত বসে খালি গল্প করে। কত গল্পই বা করা যায়? মাঝে মাঝে নেমে আসে ক্লান্তি। কাজ শেষ হ'য়ে গেছে রাত বারটায়। এত রাতে বাড়ী গেলে রাস্তায় পুলিসে ধরে। তাই অগত্যা বসে বসে জটলা পাকায় সবাই। রামনরেশ দু' লাইন গান গেয়েই থেমে যায়।

"ছোটাসে বালমা মোরে
অঙ্গনা মে গুলি খেলে"

অর্থাৎ আমার ছোট ছেলে উঠোনে গুলি খেলে।

ছোটকুন বড়হাই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কোমরে হাত দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলো "ও—হো হো..ই।" হাসিতে ফেটে পড়লো যেন সবাই। দুশ্চিন্তার গুমোট মেঘটা কেটে গেল।

বদলু রহমানকে জিজ্ঞাসা করলো "হ্যাঁ, চাচা, তুমি দশ বছরের খাজনা জমা করেছ?

"আরে হ্যাঁ দিয়েছি তবে সব খাতায় দিই নি—"

"তুমি তো তবু দিয়েছ—আমি গেলাম জমা দিতে তা গাঁয়ের লোক বললো এখন জমা দিও না। তারা কেউ দেয়নি এখনও। দেখতো মাঝখান থেকে দুমাসের ছুটি নিলাম কিন্তু কোন কাজই হ'ল না।"

—তা তুমি না জেনে গেলেই বা কেন?"

—কি করে জানবো বল? রামবুঝ সারেঙ্গ এসে বললো দেহাতে নাকি সব জমা দিয়ে ফেলেছে। মনে ক'রলাম আমি বুঝি খালি বাদ আছি।

সেখানে গিয়ে শুনলাম কম্‌লিষ্ট পারটী (কমিউনিষ্ট পার্টি) নাকি জমিদারদের মু আবজা (ক্ষতিপূরণ) দেওয়ার বিরুদ্ধতা করছে।

আর তাঁদের কথাটা খানিকটা ঠিক চাচা। এ আইনে যাদের জমি নেই তাদের জমি দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, তা ছাড়া ধর এই যে আমরা কর্জা করে দশ বছরের খাজনা দিচ্ছি এর উপরেও আবার অর্ধেক খাজনা জমিদারকে দশ বছর ধরে দিতে হবে তারপর যদি এক বছরের ফসল মারা যায় তাহলে আমাদের হালটা কি হবে? এমনিই তো কর্জার ঠেলায় ডুবে আছি।

রহমান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। দেশে আবাদের অবস্থা খারাপ। কানপুরে যে ভাই চাকরী করত তার চাকরী গেছে। অফিসে কাজ কর্মের অবস্থা খারাপ। ছাঁটাইয়ের কথা আলোচনা হচ্ছে চারদিকে।

বুড়ো শ্যামলাল হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল। চাকুরী জীবনে অনেক কিছু দেখেছে শ্যামলাল। অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যায় ওর। বুড়ো বলে "তোমরা তখনও চাকরীতে ঢোকনি—বোধ হয় চৌত্রিশ সাল হবে—তার আগেও একটা লড়াই হ'য়ে গিয়েছিল, বন্দরের অবস্থা হয়েছিল ঠিক এমনি, জাহাজ পত্তর আসে না, বাজারে সব জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন ছাঁটাই শুরু হল, ঐ যে মুস্তাফা, বিন্দেশ্বরী, রামলগনকে দেখছ ওদের চাকরী তখন পাঁচ সাত বছর পার হ'য়ে গেছে, ওরাও বাদ গেল না। আমারও গিয়েছিল। কি করি, দেশের জমিজমা তো আগেই খতম হয়েছিল। একদিন বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরতে ঘুরতে মেদিনীপুরে এক উকীলবাবুর বাড়ীতে নোকরী পেলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই শহরের বাইরে গিয়ে কাজের চেষ্টা করলো। তাদের মধ্যে অনেকেই ফিরে আসেনি। শুনছি দুচার জন না খেয়ে না খেয়ে ব্যারামে পড়লো, শেষ পর্যন্ত মারাও গেল। মনে হচ্ছে এবার তার চেয়েও হালৎ খারাপ। সেদিন অনেকেরই দেশে দাঁড়াবার জায়গা ছিল কিন্তু আজ তাও নেই। তখন যুক্ত প্রদেশের এত লোক এখানে ছিল না কিন্তু আজ দেখ ছেয়ে গেছে।"

আবার একটা থমথমে ভাব মানুষের চোখে মুখে ফুটে উঠলো। চিন্তা... চিন্তা...মহা চিন্তায় পেয়ে বসেছে সবাইকে।

গঙ্গার উপরে থমথমে কালো রাত। জল যেন নিথর নিস্পন্দ। খাঁ খাঁ

করছে বিরাট শূন্য। ওপারের ময়দা কলটার বাষ্প ছাড়ার হায় হায় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বিরাট কালো অজগরের মত জেটির শেডগুলো যেন এঁকে বেঁকে শুয়ে আছে। অজগরের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। হাঁপানীর টানের মত শব্দ করে একটা ইঞ্জিন দু'খানা মাত্র মালগাড়ী টেনে নিয়ে আসে নড় বড়ে লাইনের উপর দিয়ে। ইঞ্জিনের বয়লারের লাল আগুনটা চোখে পড়ে। বাইরের দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর দুশ্চিন্তায় খোলসের মধ্যে যেন অমনি আগুন আটকানো এখানকার সমস্ত মানুষের মধ্যে।

এত রকমারী জিনিস একই সঙ্গে ভীড় করে আসে না কোনও দিন—যেমন আসছে আজকাল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, হরতাল, পুলিসের সাথে সংঘর্ষ, দাঙ্গা চলেছে একটার পর একটা। আমরা সবাই শান্তিতে বাঁচতে চাই। জীবনটাকে চালাতে চাই বেশ সরলভাবে কিন্তু এক একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আসে। ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় আমাদের যত্নে ভাবা পরিকল্পনা—তখন সেইটে নিয়ে ভাবি।

ভাবটা চাপতে চাপতে বলে ফেলে সাধু, "শালা দুনিয়ার একটা বেমার হয়েছে।"

কথাটা ঠিক। মনে মনে সাধুকে তারিফ করে যেন সবাই।

একটা মোবিল অয়েলের বালতি হাতে করে ইসমাইল এসে দাঁড়ালো। তার পেছনে পেছনে কেষ্টো আর পরসাদী। কাজ বন্ধ হবার পরই ওরা গিয়েছিল ইসমাইলের খোঁজে। কালকে একটা সভার ইস্তাহার বিলি করবার কথা ছিল।

আজ একটু গম্ভীর দেখায় ইসমাইলকে, এটা সবারই চোখে পড়ে। সাধু জিজ্ঞাসা করলো, "কি খবর ইসমাইল ভাই এত গম্ভীর যে?"

—আরে কি বলবো শালাদের জুলুমের কথা? এই সাত নম্বর গুদোমের ভরতকে চেনো তো? ওর শরীরটা খারাপ ছিল—তা সাহেবের কাছে ছুটি চেয়েছিল কিন্তু সাহেব ছুটি দেয় নি। কিছুক্ষণ জোর করে কাজ করার পর হঠাৎ ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। এই ব্যাপার নিয়ে মাহিনাওয়ালাদের সঙ্গে গিয়েছিলাম সাহেবের কাছে। শালাকে মার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম :তা শেষ পর্যন্ত মাপ চাইলে।—বলে ইসমাইল হাতের বালতিটা ঠক কোরে ফেলে দিলে মাটিতে।

জেটির পাশে বাঁধা ফ্লোটিং ক্রেনের লশকরদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া শোনা গেল! ইসমাইল আর পরসাদী গিয়ে মিটিয়ে দেয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লাগলে ইসমাইল, পরসাদী কিংবা কেষ্টো তা মিটিয়ে দেয়। ওদের পিছন পিছন কয়েকজন লশকর জেটিতে নেমে এলো।

মজিদ লশকর বললো, "আমরা তো দেশে চললাম ইসমাইল ভাই। সরকার আর আমাদের রাখবে না। এখন থেকে তেলেঙ্গীরা কাজ করবে। সরকার বলছে যে যুদ্ধ লাগলে আমরা শত্তুরের কাজ করতে পারি।"

ইসমাইল বলে—"হ্যাঁ একথা আমি শুনেছি আগেই। সেদিন আমরা তেলেঙ্গী লশকরদের কাছে গিয়েছিলাম, ওরা আগে ভিজাগাপট্টমে কাজ করতো। সেখানে হরতালের সময় ছাঁটাই করে দিয়েছে! তারাও তোমাদের সঙ্গে মিলে লড়তে চায় কিন্তু মুশকিল করছো তো তোমরাই। তোমাদের সারেঙ্গ দুহ্ মিঞারা এর বিরুদ্ধে লড়তে চান না আর তোমরা তাদের কথায় এতদিন বিশ্বাস করেছ, এখন ঐ দালালরাই তোমাদের সর্বনাশ করছে।"

মজিদের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। নোয়াখালীর হাজার হাজার চিঠি আসে অভাবের কাহিনী নিয়ে লশকরদের কাছে—সেখানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা আর গরীবির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। অভাবের রাক্ষুসে চেহারাটা যেন হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসে।

হঠাৎ যেন ধমক দিয়ে ওঠার মত কথা বলে ইসমাইল। চোখ দুটো জল জল করে তার, "মজিদ ভাই এখানেই হোক আর পাকিস্তানেই হোক সওয়াল এক। মাথার ওপর বসে আছে শয়তানের দল···রক্তচোষা ধনীরা। খানা নেই ..আজাদী নেই...শান্তি নেই। যেখানেই যাবে সেখানেই লড়তে হবে—তা না হলে নিস্তার নেই।"

অন্য সব মজুরদের কাছে এসে এরাও বসে পড়লো। কেষ্টো বলছিল চীনের কথা। সেখানে মজুর আর কৃষকদের সরকার গড়বার জন্যে কতদিন ধরে লড়াই চলেছে। এ লড়াইয়ের নেতা হলো মজুর।

সাধু জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা কেষ্টো, পণ্ডিতজী তো মজুর রাজই কায়েম করতে চান কিন্তু তার জন্যে সময় দরকার তো—তা এর জন্যে সরকারের

বিরুদ্ধতা করতে হবে কেন ?. আর ইউনিয়নের কথার মধ্যে এত সব দলাদলিই বা কেন।"

কেষ্টো খানিকক্ষণ চুপ করে বুঝে নেয় ওর কথাটা কিন্তু জবাব দেবার আগেই পরসাদী বললো, "সওয়াল হলো আজাদীর—গরীবের আজাদীর। ইউনিয়ন হলো তার গোড়ার কাজ। এই জেটিতে দশ বছর আগে সাহেবরা লাথি মারতো, আজ মারে না কেন ? কারণ আমাদের একাই। কিন্তু তাতে এক ধাপ এগিয়েছি আমরা—এবার জুলুম এত সাঙ্ঘাতিক যে সরাসরি হামলা হচ্ছে আমাদের ওপর। এক বছরে রমেশ বাবু, রামধনী, জব্বর থেকে শুরু করে আমাদের সাধারণ মজদুর পর্যন্ত প্রায় জন তিরিশেক গ্রেপ্তার হয়েছে—সুতরাং আজকের সওয়াল একেবারে আজাদীর—তা না হ'লে কিছুরই পাকা ফয়সালা হবে না—আর আজাদীর লড়াই শুরু হয়ে গেছে।"

ইসমাইল বাংলাদেশের কয়েকটা জায়গার নাম বলে। সাধু বললো, "হ্যাঁ হ্যাঁ এক বাবু সেদিন সকালে বলছিল যে পাকিস্তানে নাকি কয়েক জায়গায় কৃষকরা হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে। রাস্তায় নাকি বন্দুক ধরা চাষীদের ছবি এঁটে দিয়েছে কারা ?"

সারা বাংলা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য যে এই অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠছে। তার শরীরের একটু আধটু অংশ মাঝে মাঝে দেখা যায়। কেউ বলে মারামারি, কেউ বলে হরতাল। সারেঙ্গরা বিশ্বমিত্র কাগজ পড়ে ঐ কথাই আলোচনা করে—কি যেন একটা আসছে, কি যেন একটা হবে, এই আলোচনা আর আশঙ্কা উঁকি ঝুঁকি মারে।

সাধু বললো, "তুলসীদাস বলে গেছে যে কলিযুগে শূদ্রের রাজ হবে, দেহাতে যে চামাররা গোবরের ভেতর থেকে যব, গম ঘেঁটে বের করে ধুয়ে নিয়ে খেতো তারাও আজকাল হরতাল করছে।"

অন্যান্য রাতে সময় পেলে সবাই একটু ঘুমুতে চায় কিন্তু আজকের কথাবার্তার মধ্যে যে কি ছিল—কেউই ঘুমোনোর কথা ভাবলো না। এই কথাটাই ভাবছিল ইসমাইল। মাইনে বাড়ানো, মাগ্‌গীভাতা বাড়ানোর চেয়ে এতে যেন সবার উৎসাহ বেশী।

মঙ্গল ঝুমিকে এদিকে আসতে দেখা গেল। মঙ্গলের মুখে দুশ্চিন্তার

ছাপ। ইসমাইল জিজ্ঞাসা করে, "কি খবর মঙ্গল ভাই কাল বাড়ী যাওনি ? তোমাদের তো দশটায় ছুটি হয়ে গিয়েছিল।"

মঙ্গল বললো, "একজন পুলিসের কাছে শুনলাম আমাদের পাড়ায় দাঙ্গা লেগেছে—তাই রাত্রে এখানেই ছিলাম।"

এ খবরে আশ্চর্য হয় না কেউই। কয়েকদিন ধরেই ফুসফাস গুজব শোনা যাচ্ছিল। এই অফিসের এক বাবুর বাড়ী খুলনায় বাগের হাটে। সেই বলছিল যে সেখানে পুলিস চাষীদের উপর ভীষণ জুলুম করেছে। অথচ এই খবরটা বিশ্বমিত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে ছাপা হয়েছে। আসলে লড়াইটা হয়েছিল চাষী-জমিদারে।

অফিসের বাবুদের আলোচনায়ও টের পাওয়া যাচ্ছিল যে শহরের অবস্থা এই নিয়ে গরম হয়ে উঠছে।

দাঙ্গার খবরে মুসলমান মজুরদের ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। সবাই ভাববার চেষ্টা করে সামনে কি আসছে। কার জীবন বাঁচবে ? কে মারা যাবে ?

রহমান আস্তে আস্তে উঠে এসে ইসমাইলের কানে কানে বলে, "কি হবে ইসমাইল ভাই—জানটা বাঁচাবো কি করে বল ? সে সময় পাকিস্তানেও গেলাম না, ভাবলাম দেশ যখন ভাগ হয়ে গেল হয়তো আর দাঙ্গা বাধবে না—কিন্তু এখন দেখছি খাতরা।"

ইসমাইল বলে, "এখন পর্যন্ত আমি কিছুই জানি না, কাজেই তোমাকে বিশেষ কিছু বলতে পারবো না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, পাকিস্তান বা এখানে, যেখানেই যাওনা কেন এক এক রকমের খাতরা থাকবেই। রুজী রোজগার, ঘরবাড়ী, দাঙ্গার সওয়াল সব জায়গাতেই—কিছুদিন আগেও পাকিস্তানে বিহারী মুসলমান আর বাঙ্গালী মুসলমানে গোলমাল হয়েছে, যেমন এখানে হচ্ছে হিন্দুস্থানী হিন্দু আর বাঙ্গালী হিন্দুতে। গরীবের জন্যে সব জায়গাতেই খাতরা আর এই খাতরার বিরুদ্ধে হিম্মত নিয়ে না লড়লে বাঁচার উপায় নাই।

কথাটা রহমানের মনে লাগে। কিন্তু পাকিস্তানে যাওয়ার কথাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। ও ভাবে, তবু তো জানটা বাঁচতো।

কিছুক্ষণ আগেও হিন্দু আর মুসলমান মজুরে ছিল না কোন পার্থক্য কিন্তু

ঐ একটা খবরে মনের মধ্যে সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি মারে কিন্তু দাঙ্গার সমর্থনে কারুরই মুখ দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না।

পরসাদী ইসমাইলকে বললো, "কয়েক দিন ধরেই মনে হচ্ছিল যে একটা গোলমাল বাধবে কারণ চারদিকেই কিসান মজদুর মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। সমস্ত দমননীতি ব্যর্থ হয়েছে এবারে শেষ হাতিয়ার ছেড়েছে ধনীরা। গেল বার ১৬ই অগস্টের দাঙ্গা বেধেছিল কখন? যখন হিন্দু মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে সারা দেশ রুখে দাঁড়িয়েছিল।"

রওশন ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে গিয়ে ক্রেনের তলায় দাঁড়িয়ে কাঁদে। গতবারের দাঙ্গায় ওর বাপ, মা, স্ত্রী কাটা পড়েছিল। সেই স্মৃতি আর ভবিষ্যতের আশংকা ওর হৃদপিণ্ডকে যেন মুচড়ে দেয়। বায়স্কোপের ছবির মত ভেসে বেড়াচ্ছিল গত বছরকার দাঙ্গার দৃশ্যগুলো। মজুরদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোকের কিছু না কিছু ক্ষতি হয়েছিল। দাঙ্গার পরে যখন সবাই কাজে এলো তখন পচা গন্ধে গঙ্গার ধারে দাঁড়ানো যেতো না। একদিন জল পুলিস ছ'নম্বর জেটির কাছে ছত্রিশটা লাস বেঁধে রেখেছিল। তার মধ্যে বাপ, মা আর ছোট একটা ছেলেকে একসঙ্গে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। শত শত মানুষ সে দৃশ্য ভুলতে পারেনি আজও—তাদের ধর্মের কথাও কেউ ভাবেনি। আর সেখানে দাঁড়িয়ে সুখদেও বলেছিল,—এঃ সব গরীব। এ কথাটা আজও ভোলেনি মজুররা।

এতক্ষণ সুখদেও চুপচাপ বসেছিল। কারণ মানুষটা অমনি চাপা। আগে ছিল মিলিটারীতে। সেখান থেকে পালিয়ে এখানে চাকরী নেয়। লোকটা গোঁয়ার। একশ কথার পেছনে হক্ কথা এক আধটা বলে ফেলে। গতবারের সেই দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয় সুখদেও।

লড়াই আর দাঙ্গার উপর ওর ভীষণ ঘৃণা। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "শালা লোক এক টেবিল পর খানা খাতা হায় ঔর হম লোক আপস্ মে খুন খারাবি করতে হেঁ—শালা বুদ্ধুকা জাত!"

ইসমাইল, পরসাদী আর কেষ্টো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করে ফেলে যে দাঙ্গা সম্বন্ধে মজুরদের মধ্যে প্রচার করা হবে।

রাত ভোর হ'য়ে আসে। দল বেঁধে বেঁধে বাড়ী ফেরে সবাই।

অন্যদিনকার মত আজ কলরব নেই। সবাই ভাবে পরের মুহূর্তে কি খবর আসবে।

ওরা তিনজন একসঙ্গেই বাড়ী ফিরলো। ইসমাইল ওদের খাওয়া দাওয়া সেরে আসতে বললো।

ইসমাইলের বউ আমিনা খুব সকালেই ওঠে। ইসমাইলকে দেখে তাড়াতাড়ি রুটি আর চা বানানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ও। ওর মুখে গম্ভীর ভাব দেখে আমিনা মনে করলো, "রাতজাগার জন্যেই বোধ হয় ও রকম হয়েছে।"

চা রুটি খেতে খেতে রোদ উঠে গেল। বস্তির লোকেরা এখনও দাঙ্গার খবর পায়নি বোধ হয়, ভাবলো ইসমাইল। কি করতে হবে তাই ভাববার চেষ্টা করে ও।

সামনের বাড়ীর বারান্দায় ইয়াকুবের ছোট মেয়ে জাবেদা একটা পুতুল নিয়ে খেলা করছে। ইসমাইল ওকে বড় ভালবাসে। ওকে নানী বলে ডাকে। ওর নিজের মেয়ে ফিরোজার জন্যে যদি কখনও কিছু খাবার জিনিস কিনে আনে তাহ'লে জাবেদাকেও দেয়। বস্তির ছোট ছেলেমেয়েদের মস্তবড় একটা খেলার আড্ডা হ'ল ইসমাইলের বাড়ী।

এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও জাবেদাকে দেখে খুশী হয় ইসমাইল। "নানী কি করছিস?" জিজ্ঞাসা করল ইসমাইল।

—জামা তৈরী করছি চাচা।

—আমাকে একটা জামা দিবি?

—আচ্ছা দেবো—আগে এইটে হয়ে যাক তারপর দেবো। নাকের নোলকের তলায় ছোট্ট ছোট্ট দাঁতগুলো চিক্ চিক করে জাবেদার।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফিরোজা বেরিয়ে আসে। ইসমাইল কাছে ডেকে নেয় ওকে। বদনার জল দিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে দেয়। নিজের রুটি থেকে একখানা রুটি আর খানিকটা চা দেয় খেতে। ওর মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে সাপটে দেয় ইসমাইল।

দরজার পাশ থেকে আমিনা বলে, "ওর জন্যে তো আছে, আপনি খান না।"

—আমার হয়ে গেছে—থাক্ থাক্।

কিছুক্ষণ বাদে কেষ্টো আর পরসাদী এসে হাজির হলো।

হাওড়ার এদিকে ওদিকে দু'একটা আগুন লাগানোর খবর শোনা গেল।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত ওরা টিকিয়া পাড়া, পিলখানার মজুরদের সঙ্গে আলোচনা করলো। বেশীর ভাগ মজুরই দাঙ্গা চায় না কিন্তু দাঙ্গার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সাহস পায় না তারা। তারা বলে, "হাতিয়ারের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করবো কি করে ?" দাঙ্গার পক্ষেও কিছু কিছু লোক সর্বত্রই আছে। তার মধ্যে কয়েকজন সারেঙ্গ আর সর্দার আছে।

রাস্তায় আসতে আসতে পরসাদী বললো, একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছ ইসমাইল ভাই —রামদেও, রাজবল্লী যে কজন দাঙ্গার পক্ষে খুব গরম গরম কথা বললো সব কজনেই কিন্তু গেলবার আমাদের হরতালের সময় দালালী করেছিল।

কেষ্টো আর ইসমাইল দু'জনেই সায় দিল ওর কথায়। পিলখানায় একটা নতুন কথা শোনা গেল। রামবুঝ সারেঙ্গ বললো, "এ দাঙ্গা বাঙ্গালীরা করছে।" কেষ্টো তার মুখের উপর বলে, 'তুমি আজকাল প্রায়ই হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী ঝগড়ার কথা বল ! গেলবার দাঙ্গায় বলতে মুসলমান মারার কথা। আচ্ছা বলতে পার এবার তোমায় কাছে বাঙ্গালী হিন্দু আর হিন্দুস্থানী হিন্দুরা এমন আলাদা হয়ে গেল কেন ?"

রামবুঝ খুব চটে গিয়ে বললো "দেখো তোমরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছো—অত ভাই ভাই করে চেঁচামেচি করো না। আর আমাদের পিলখানায় ঢুকলে মার খাবে।" আশে পাশে মজুরদের মধ্যে কয়েকজন সারেঙ্গের কথা সমর্থন করলো। ওরা যেন কোন কথাই আলোচনা করতে দিতে চায় না।

ওরা তিনজন তবু খানিকটা কথা বলবার চেষ্টা করে। ক্রমশ ভীড় বেড়ে যায়। একজন চেনা গুণ্ডাকেও আসতে দেখা গেল।

রামবুঝ চেঁচিয়ে বললো, "শালা মুসলমানের আস্পর্দ্ধা দেখ—পাকিস্তানে রক্তগঙ্গা বইয়ে এখানে এসেছে দালালী মারতে। আর পরসাদী তোমার লজ্জা নেই হিন্দু হয়ে মুসলমানের সঙ্গে শান্তি শান্ত করতে বেরিয়েছো ?"

পরসাদী আর কেষ্টো গর্জন করে উঠল। হঠাৎ সুখদেও ওখানে এসে হাজির হল। সুখদেওকে দেখে রামবুঝ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কারণ ও

আগে সুখদেওয়ের হাতে একবার ঠেঙ্গানী খেয়েছিল। এ ঘটনার পরও ওরা আলোচনা চালালো।

সুখদেও বললো, "আমি দায়িত্ব নিচ্ছি ওর। ওকে চেনো না তোমরা তবে বলি শোন—দুটো মুদিখানা দোকান আছে ওর, শিবমন্দির গড়ার নামে চাঁদা তুলে মেরে দিয়েছে। আর্যসমাজ, কংগ্রেস সব জায়গাতেই ও যাতায়াত করে আর এ পাড়ার যত বদমাইস লোক আছে তাদের সঙ্গেও খুব দহরম মহরম।"

কেষ্টো সুখদেও সম্বন্ধে খুব আগ্রহ দেখালো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ীর অবস্থা, রুজী রোজগারের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলো। দাঙ্গার আলোচনার মধ্যে কেষ্টোকে এই সব প্রশ্ন করতে দেখে অবাক হয় ইসমাইল। পথে আসতে আসতে কেষ্টোকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে। কেষ্টো বলে "লোকটা খুব জঙ্গী। তোমার বোধ হয় মনে আছে যে গত ধর্মঘটের সময় দালাল পেটার কাজে সুখদেও আর তার সঙ্গে ছয় সাতজন খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল। তা ছাড়াও প্রত্যেকটা ব্যাপারেই দেখেছি যে লোকটা খুব লড়াকু। ছুত অচ্ছুৎ বা জাত বিচার ওর মধ্যে নেই বললেই চলে। ওর সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের সঙ্গে বের করতে হবে।

ইসমাইলকে একটু মনমরা দেখাচ্ছিল। পরসাদী ওর বিমর্ষতার কারণ খানিকটা বুঝতে পারে। রামবুঝের গালাগালিতে ইসমাইলের মনে নানা রকমের সন্দেহ দেখা দিয়েছে, তা ছাড়া মুসলমানদের উপর গালাগালিটাও যেন তেমন বরদাস্ত হয় নি। যদিও ইসমাইল বলে যে সে জাত বা ধর্মের গোঁড়ামী মানে না কিন্তু আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে দেখলে যে মনের মধ্যে কিছুটা অভিমান রয়ে গেছে। আলোচনার মধ্যে পরসাদী দেখিয়ে দেয় সেটা। ও বলে, একদিন ঐকটা আলোচনায় আমারও হিন্দুস্থানী অভিমান দেখা দিয়েছিল কিন্তু হিমাংশুবাবু আমাকে রীতিমত গালাগাল করে ঠাণ্ডা করে দেন। আমার আজও বেশ মনে আছে—তিনি বলেছিলেন "ধনীরা এই সব কুনোবৃত্তি সৃষ্টি করে গরীবের মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়, কিন্তু তোমরা মজুরদের নেতা হয়ে এসব সংকীর্ণতার মধ্যে ডুববে কেন ?"

গরীব হিন্দুদের সঙ্গে গরীব মুসলমানের তফাত নেই, তারা এক সঙ্গে দাঙ্গার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এ কথা যুক্তি দিয়ে বেশ বুঝছিল ইসমাইল কিন্তু

পুরো আস্থা ছিল না তার উপর। পরসাদীর সঙ্গে কথা বলে সংশয় অনেক কেটে যায়।

রাত ডিউটি দিয়ে এ পর্যন্ত কেউই শুতে পারে নি। ঘুমে তিনজনেরই চোখ জড়িয়ে আসে। নিজেদের বস্তিতে এখনও আলোচনা করা হয় নি। দাঙ্গা যে ভাবে ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে তাতে আজ রাত্তিরে যে টিকিয়া পাড়ায় হামলা হবে না, তা জোর করে বলা যায় না কেষ্টো বলল।

শেষ পর্যন্ত ঘণ্টা খানেক খেটে খুটে লোক জড়ো করে কথাবার্তা হলো যে পালানো হবে না। যদি আক্রমণ হয় তা হলে প্রতিরোধ করা হবে। মাতব্বররা বেশীর ভাগই এখান থেকে পার্ক সার্কাস এলাকায় সরে যাওয়ার পক্ষে। তারা অনবরতই লোকের মধ্যে হতাশা ছড়াচ্ছে। যে টুকু প্রতিরোধের মনোভাব সৃষ্টি করা গেল তাও সত্যি সত্যি আক্রমণের মুখে টিক্‌বে কিনা তা বুঝতে পারেনা ইসমাইল। রাতের জন্যে জনকতক নওজোয়ান ছোকরাকে পাহারা রাখা হল। তাদের সঙ্গে থাকবে পরসাদী।

সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে ইসমাইল। অন্য ঘরেও আজ সাড়াশব্দ কম। অবোধ শিশুদের কান্না বা কথা কওয়ার টুকরো আওয়াজ ভেসে আসে কানে। মাথার মধ্যে চিন্তার স্রোত চলেছে যেন।

পাশেই আমিনা চুপচাপ শুয়ে আছে। সকাল থেকে মন মেজাজ ভাল না ওর। পাশের বাড়ীর বুড়ী চাচী ওকে গালাগালি দিয়েছে। ইসমাইলের বাড়ীতে কেষ্টো বা পরসাদী আসে, চা খায় আর তাদের সামনে আমিনা ঘোরা-ঘুরি করে,—এই নিয়ে বুড়ীর দুশ্চিন্তা, বুড়ীর মতে এ বস্তির মধ্যে এমন মেয়ে-মানুষ নাকি আর দুটি নেই। আমিনা আগে বোরখা পরতো কিন্তু ইসমাইলই তাকে বারণ করেছে! এই নিয়ে দিনকতক খুব আলোচনা চলেছিল বস্তির মধ্যে কিন্তু ইসমাইলের বেপরোয়া ভাবের জন্যে সামনে কেউ কিছু বলে নি। অন্যদিন হলে কথাটা ইসমাইলকে বলতো কিন্তু আজ সমস্ত দিনের হালচালে কথাটা ভুলে যায় আমিনা। ইসমাইলের হাতটা ওর পিঠের উপর এসে পড়ে। আলতো ভাবে হাতটা টেনে নেয় ও। নিয়ে স্বামীর সম্বন্ধে গর্ব করে আমিনা। সত্যি বলতে কি ছেলেবেলায় যে

অবস্থার মধ্যে বড় হয়েছে, যে চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেছে—আজ যেন সে পৃথিবী আর এক রকম।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে স্বামীর মাথাটা আরও কাছে টেনে নেয় আমিনা। সারাদিনের আতংক ভুলে যায়, ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখ।

বস্তির অনেক ঘরেই আজ নিদ্রাহীন মানুষ। অন্ধকারের কালো যবনিকার আড়ালে প্রেতের দল অপেক্ষা করছে যেন। দূরের বড় বড় কোঠা বাড়ীর জানালা দিয়ে আলো দেখা যায়। শহরের কলকারখানায় খেটে খাওয়া মানুষদের বস্তির দিকে তার নজর। খাটুনীর ক্লান্তি আর আশংকা নেমে এসেছে সবার শরীরে। কাঠের গুঁড়ির উপর বসে একটা বিড়ি ধরায় পরসাদী। রাত বারোটা বাজলো। কাল সারারাত আর আজ সারাদিন ঘুম নেই। তেতো বিষ যেন বিড়িটা। দু একটা টান দিয়ে জোরে চেপে ধরে কাঠের গুঁড়িটার উপর। বিড় বিড় করে আপন মনেই বকে পরসাদী, "শালা কুত্তাকা জাত"। ওর বড় মুখটার উপর কয়েক গাছা চুল এসে পড়েছে। অনেক কাল ধরে ঘন লাঠি দিয়ে পিটেছে কেউ ওর মুখের উপর।

হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে গুলি আর বোমা ফাটার প্রচণ্ড আওয়াজে চমকে উঠলো পরসাদী। ওরা মনে করেছিল পশ্চিম থেকেই আক্রমণ শুরু হবে। প্রথমটা তাই বুঝতে পারে না কি করবে। সামনে অনিবার্য মৃত্যু। শেষ বারের মত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সামান্য সময় লাগে। কি ভাবলো পরসাদী? বউ, ছেলের কথা? নিজের বাঁচা মরার প্রশ্ন? হয়তো তাই, হয়তো তার সঙ্গে সমস্ত শয়তানের চক্রান্ত। কিন্তু তাছাড়াও আর একটা কথা ভেবেছিল সে, ভেবেছিল এক দল মানুষের কথা, আর এক মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের কথা।

কেষ্টো আর ইসমাইল ইতিমধ্যেই এসে পড়লো। ওরা চট্‌পট্‌ কাজ ভাগ করে ফেলে। বস্তির কয়েক ঘর হিন্দু বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা হ'য়েছিল আগেই। তারা অবশ্য আত্মরক্ষার জন্যে খুব উৎসাহ দেখায় নি। তাদের অবস্থাটা হয়েছিল অদ্ভুত। গুণ্ডারা এখানকার হিন্দু বাসিন্দাদের পরোয়া না রেখেই বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দিল। ওরা ভাবলো যে বাইরের আক্রমণে যদি এখানকার মুসলমানরা প্রতিশোধ নেয়? কেষ্টো অনেকক্ষণ ধরে বোঝায় অবস্থাটা। হিন্দুদের মধ্যে কয়েকজন নওজোয়ান বেরিয়ে এলো।

ওপাশে পাহারাদার ছোকরাদের মধ্যে জোর গলায় কথা বলতে শোনা গেল। ইসমাইল ছুটে গেল ওধারে। একজন মাঝবয়সী লোককে গালাগালি দিচ্ছে ওরা। লোকটা নাকি বস্তির হিন্দু ক'জনকে সাবাড় করে দিতে বলেছিল। ইসমাইলের মাথার মধ্যে দিয়ে যেন আগুন খেলে গেল। এ লোকটার উপর অনেকদিন ধরেই সন্দেহ আছে ইসমাইলের। লোকটার নাম গোলাম মহম্মদ। চাকরী বাকরী কিছু করে না অথচ থাকে খুব বাবুয়ানা কায়দায়। মাঝে মাঝে কোথায় যায়। আগে লোকটা লীগের চাঁই বলে পরিচয় দিত।

নওজোয়ানদের মধ্যে একজন বললো, জানেন ইসমাইল ভাই গোলাম মহম্মদ আপনাকে মুসলমানের দুশমন বলে রটাচ্ছে।

ইসমাইল আর আলোচনার মধ্যে না গিয়ে গোলাম মহম্মদের কোমরে প্রচণ্ড জোরে মারলো এক লাথি। দেখতে দেখতে পাহারাদার ছোকরারা ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার উপর। আর্তনাদ করে পড়ে গেল লোকটা হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে এসে কেষ্টো বললো, "হিন্দুদের মধ্যে কয়েকজন ছোকরা আসছে কিন্তু ওপাশে দেখগে সমস্ত মেয়েরা কান্নাকাটি করছে তাতে লোকে আরও ঘাবড়ে যাচ্ছে।"

ইসমাইল ছুটলো ওদিকে। এক গাদা মানুষ জমা হয়েছে সেখানে। "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি আর কান্নার শব্দে একটা আতংকময় আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। অতি বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকেরও মন দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইসহাক সর্দার এই আতংকের মধ্যে আরও আতংক ছড়াচ্ছে। ওকে দেখে ঘৃণা হয় ইসমাইলের। পয়সার জোরে অনেকদিন এখানে প্রতিপত্তি খাটিয়েছে ইসহাক সর্দার। হরতালের বিরুদ্ধতা করে পদোন্নতি হয়েছে। আগে মহল্লা লীগের সেক্রেটারী ছিল, ইদানীং কংগ্রেসের মেম্বার করছিল। নিরাপদে থাকার আশ্বাসে বহু লোকই কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছিল। গোলাম মহম্মদের সঙ্গে ইসহাক সর্দারের দহরম মহরমটাও সবাই জানে কিন্তু তাদের স্বরূপটা কেউ ভাল করে বুঝতে পারে নি। বিপদের মুখো-মুখী দাঁড়িয়ে আজ বস্তির সমস্ত লোকের ভিতরে চেহারাটা যেন উলঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে।

ইসমাইল প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল, "চুপ কর কাপুরুষ কোথাকার। সারা

জীবন গরীবের সর্বনাশ করেছ আর আজ বিপদের সামনে মেয়েদের পেছনে দাড়িয়ে কাঁদছো—ফের যদি একটু চীৎকার কর তা হলে ঠেঙ্গানি ...বে।" ইসমাইলের ধমকে ইসহাকের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই চুপ করে। ইসমাইল খানিকক্ষণ বোঝায় সকলকে, "চুপ করে পড়ে পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা কর—যে এগিয়ে যেতে পারে সে এগিয়ে আসুক আর যার সে সাহস নেই সে জলন্ত ঘরগুলো থেকে জিনিস-পত্তর টেনে বের করুক—ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নিক—আহতদের সেবা শুশ্রূষা করুক। ইসহাক সর্দারের পাকিস্তানের লোভে ভুলো না কেউ। সেখানেও এই অবস্থা—মনে রেখো—এ দাঙ্গাই শেষ নয়। পাকিস্তানেও বাঙ্গালী-বিহারী মুসলমানে দাঙ্গা লেগেছিল। ধনীরা সমস্ত জায়গাতেই এই বিষ ছড়িয়েছে। আমরা গরীবরা মরছি। কিন্তু তারা বসে একত্রে খানা খাচ্ছে। তাদের হিন্দু মুসলমান নেই। তাদের জাত এক।"

এত আতংকের মধ্যে ইসমাইলের কথাগুলো মন দিয়ে শোনে মানুষগুলি। মনের ভেতরটা যেন খানিক খানিক সায় দেয়। কিছু কিছু লোক এগিয়ে আসে কাজের জন্য। সম্পূর্ণ ভরসা নেই তাদের মধ্যে। ইসহাক সর্দার বা হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যেও দু'একজন প্রতিরোধের বিরুদ্ধতা করে। তাদের যুক্তি—বিরুদ্ধতা করলে বেশী মারবে। এতগুলি মানুষের আতংক আর প্রতিপত্তিশালী লোকের বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে ইসমাইলকে লড়তে হয় প্রতি-পদেই। মাঝে মাঝে মনে হয় এদের বোঝানো যাবে না। নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে এগোতে হয় ইসমাইলকে।

প্রথমবার আক্রমণের পর গুণ্ডারা সরে গিয়েছিল, আবার কিছুক্ষণ বাদেই পুব দিক থেকে আগুন জ্বলে উঠলো। এ দিককার কাজ সেরে কেষ্টো পরসাদীর সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের সঙ্গে কয়েকজন হিন্দু বাসিন্দা আর মুসলমান নওজোয়ানরা প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। যে গলির মুখটায় আক্রমণ শুরু হয়েছিল সেখান দিয়ে বেরুনো বেশী বিপদজনক মনে করায় ওরা ডানদিকের একটা ঘরের বেড়া কেটে গুণ্ডাদের পিছন দিকে যাবার চেষ্টা করে। ফট্ ফট্ শব্দে একঝাঁক গুলি চলে গেল মাথার উপর দিয়ে। এত গুলি চালায় কারা? গুণ্ডাদের হাতে এত বন্দুক আছে? সবাই মনে মনে ভাবে। জনকুড়ি গুণ্ডা রাস্তার ওপাশ থেকে আবার আক্রমণের জোগাড় করছিল। তাদের মতলব ছিল একেবারে বস্তিতে ঢুকে পড়বে। হঠাৎ

পেছন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ায় ওরা দৌড় দিলে একটা গুণ্ডা হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে পরসাদী। খানিকক্ষণ লড়ে অবশ হয়ে পড়ে লোকটা। মুসলমান ছোকরারা ঠিক সাহস পায় না ওর গায়ে হাত দিতে। কেষ্টো এগিয়ে আসে। হু'তিন পা এগুতেই গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় কেষ্টো। বুকের ঠিক মাঝখানে একটা গুলি লাগলো। অব্যক্ত যন্ত্রণায় বললো কেষ্টো, পার্টিকে বলিস্। গুণ্ডাটার পিঠেও একটা গুলি বিঁধেছে। পরসাদী চিৎকার করে, 'সবাই ভিতরে যাও"। মাথার পেছনে যেন গরম কি ছুঁয়ে গেছে। বস্তির ভেতরে ঢুকে পড়বার আগে ওর নজরে পড়লো একটা পুলিসের গাড়ী ধীরে ধীরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কেষ্টোর দেহটা ওরা যাবার সময় নিয়ে যায়। নেতিয়ে পড়েছে দেহটা। মুহূর্তের মধ্যে কি ঘটে গেল যেন। মাথার মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করে পরসাদী। ওর চোখ দিয়ে হু হু করে জল বেরিয়ে আসে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই। সবার চোখে জল। মুহূর্তের মধ্যে কি একটা ঘটে গেল! হতভম্ব হয়ে গেছে পরসাদী।

কিছুক্ষণ বাদে হুঁশ ফিরে আসে। শরীরে যেন বল নেই। ঘাড়ের কাছটায় চিন্ চিন করছে। একটা গুলি ছেঁচড়ে গেছে। মনে পড়ল সেই কথাটা—"হাজার বিপদের মধ্যেও তারা ভেঙ্গে পড়ে না।" "তাই তো কি করছি আমি?" নিজের কাছে প্রশ্ন করে পরসাদী। ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে চললো পরসাদী।

এদিকে ইসমাইল আহত ক'জনের প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেই শুনতে পেল কেষ্টোর খবর। ও সেদিকেই ছুটে যাচ্ছিল। রাস্তায় পরসাদীর সঙ্গে দেখা। পরসাদী বললো, "ওদিকে যাবার দরকার নেই, মন খারাপ হবে আরও। এক্ষুণি হয় তো পুলিস আসবে। তারপর আর কাজ করতে পারবে না।"

ইসমাইল কথা কয় না। থম্ থম করছে ওর মুখটা। ভোরের আলো ফুটে উঠছে! কালো পোড়া কয়লা চারদিক থেকে ঢেকে ফেলতে চায় যেন। কাদা, জলে আর ছাইতে সমস্ত উঠোনগুলো মাখামাখি। একটু দূরে একটা পুতুল পড়ে আছে।

ধক্ করে ওঠে ওর বুকের ভিতরটা। নানীর পুতুল। ছোট্ট একটা

সংসারের উপর যেন প্রচণ্ড একটা বোমা ফেলে চুরমার করে দিয়েছে। পুতুলটা তুলে নিয়ে ফেলে দেয় ইসমাইল। কেষ্টোর রক্তাক্ত দেহের একটা ছবি ভেসে ওঠে তার মনে। প্রচণ্ড শক্তিতে হাত মুঠো করে ইসমাইল। দাঙ্গার স্রষ্টাদের যদি ও পেতো ওর হাতের মুঠোর মধ্যে! এই ষ্টেনগান-ওয়ালা গুণ্ডাদের পেছনে একটা বীভৎস্য জানোয়ারের মুখ কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিল ইসমাইল। সে থ রোজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যেন ওর কাছে।

কয়েকদিন কারফিউ অর্ডারের জন্যে অফিস যেতে পারে নি ইসমাইল। পরসাদীও জ্বরে পড়েছে। তিনজনের একজন চলে গেছে। যাবার সময় দায়িত্ব দিয়ে গেছে—বুকের রক্ত দিয়ে তা পালন করতে হবে। গোলাম মহম্মদ আর ইসহাক সর্দার এখান থেকে সরে পড়েছে।

অফিসে এসে দেখলে গৃহহারা ক্রেন ডাইভাররা ভীড় করে বসে এক জায়গায়। হিন্দু শ্রমিকরা সমবেদনা জানায়। তাদের মনেও ঘৃণা।

বাবুদের মধ্যে বিমর্ষভাব: পূর্ব-পাকিস্তানের ভীষণ দাঙ্গার খবর এসেছে। এখানেই এক বাবুর পরিবারের কয়েকজন মারা গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে সে। একটু দূরে চেয়ারে বসে কাঁদছে একজন মুসলমান কেরানী। পাইক পাড়ায় তার বাড়ী! সর্বস্বান্ত হয়ে পার্ক সার্কাসের ক্যাম্পে উঠেছে। অফিসের বাবুদের মধ্যে নানারকম মত। কেউ প্রতিশোধ নিতে চায়, কেউ চায় লোক বদল, কেউ চায় যুদ্ধ—কিন্তু নিজেরাই শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা পায় না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় এক—"বাংলাকে চুরমার করবার ষড়যন্ত্র। কিন্তু কেন?"

ইসমাইল এগিয়ে যায় গুদামের মধ্যে। একদল মজুর খুব হাসছে। একজন মুসলমান মজুরের জ্বর এসেছে। তাকে ঘিরে হাসাহাসি। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করলো ইসমাইল। সাধু বললো, ওর জ্বর এসেছে। বললে শীত করছে—তাই মঙ্গলরাম নিজের গেঞ্জি খুলে দিলে, তাতে শীত গেল না, আমি একটা বস্তা চাপা দিলাম তাও শীত গেল না। তাই রামজিত বলছে যে গুদোমের ঐ মদের একটা বাক্স ভেঙ্গে খানিকটা খাইয়ে দে, গরম হয়ে যাবে—তা ও খেতে চায় না, এই নিয়ে হাসছি আর কি?"

"আশ্চর্য মানুষের জীবন। বীভৎস্য দাঙ্গা তা ঢেকে দিতে পারবে না" এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় ইসমাইলের মনে। দুই বাংলায় নিপীড়িত মানুষই

এখানে হাজির। তাদের চোখের জল ওর মনকে আরও দৃঢ় করে আর ঘৃণা বাড়ায় দুশমনের বিরুদ্ধে।

টিকিয়া পাড়া থেকে একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ওকে খবর দেয় "পরসাদীকে ধরে নিয়ে গেছে।"

—কি ? ধরে নিয়ে গেছে ? তা তোমরা কি করছিলে।

—আমরা কেউ ছিলাম না সে সময়।

আগুন জলছে ইসমাইলের মনে। তার পুরনো জীবনের সমস্তটাই যেন পুড়ে যাচ্ছে আর তার ভেতর থেকে গড়ে উঠছে খাঁটি ইসমাইল—এক মজুর নেতা ইসমাইল—এক সাম্যবাদী ইসমাইল!

জেটির সামনে ইংরেজ মালিক আর-এস-এন'এর জাহাজ কোম্পানির বিরাট অফিসটা সমস্ত বাড়ীর উপর দিয়ে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে আর তার উপর উড়ছে তেরঙ্গা পতাকা। সমস্ত বীভৎসতার পিছনে সত্যটা যেন জল জল করছে।

জলন্ত চোখে ইসমাইল একবার সেদিকে দেখলো। এগিয়ে চললো ইসমাইল মজুরদের দিকে।

—দীনবন্ধু দে

'সাক্ষাৎ যমে'র যমপ্রাপ্তি

[ডি, মেডভেডিয়েভ রচিত "এটা ঘটেছিল রোভনোর কাছে" নামে বইটার একটা অংশ আমরা নীচে তুলে দিলাম। হিটলারের দখলের সময় লেখক ইউক্রেনের পার্টিসান বাহিনীর একজন অধিনায়ক ছিলেন।]

"রেবেস্টিয়ানি থেকে এই মাত্র আমাদের গুপ্তচরেরা ছুটতে ছুটতে ফিরল", স্টেকভ উত্তেজিতভাবে বলতে শুরু করল, "তারা খবর দিল যে কামান আর ফীল্ড গান সমেত একটা বড় পিটুনি সৈন্যদল এসে পড়েছে। এই এক ঘণ্টা আগে আমি খবর পেলাম যে কিভার্টসিতেও জার্মানদের একটা বড় দল ট্রেন থেকে নামছে। সকালেই যাতে তারা আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করতে পারে, তারই জন্য তারা এখন তাদের পথ দেখিয়ে দেবার লোক খুঁজছে।"

এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। দু' সপ্তাহ আগে কুজনেটসভ খবর দিয়েছিল যে, পিটুনি সেনাদল আমাদের বনের ভিতর ঢুকবার পরিকল্পনা করেছে এবং তারা পিছনে লাগবে আমাদেরই।

কুজনেটসভ লিখেছিল :

"আমি জানতে পেরেছি যে, কোচ সম্প্রতি বিমানযোগে রোভনোতে এসে পৌছেছে। সে ইউক্রেনের পিটুনি সেনাদলের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ভন ইলজেনকে ডাকিয়ে তাকে হুকুম দিয়েছে, যতদূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে কর্নেল মেডভেডিয়েভের গেরিলা দলকে নিকেশ করতে হবে

"জেনারেল ইলজেন তার অন্তরঙ্গ লোকদের বলেছে যে সে জেনারেল পাইপারের নেতৃত্বাধীনে অভিযান চালাবার হুকুম দিয়েছে। এই জেনারেলটির আর এক নাম হ'ল "সাক্ষাৎ যম"। ইলজেন নিজেও পার্টিসান বা গেরিলা-বাহিনীর বিরুদ্ধে এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করতে চায়। তার ইচ্ছা নাকি যে, সে নিজেই "পার্টিসানদের শিবিরে তাদের সঙ্গে কথা কইবে।"

"তোমার নিজের 'শিবিরে' জেনারেল ইলজেন যাতে তোমার সঙ্গে 'কথা কইতে পারে'—তার সুযোগ তাকে দেবার চেষ্টা আমি করব।"

চিঠির সঙ্গে লড়াইয়ের একটা পরিকল্পনাও ছিল। আমরা পরিকল্পনাটি বেশ ভাল করে দেখে সেটি অনুমোদন করলাম।

আমি আমার দলের কমরেডদের বললাম, "কমরেডস, আমরা খবর পেয়েছি যে, কাল সকালে "পিটুনী" সৈন্যবাহিনী আমাদের আক্রমণ করছে। আমরা এখান থেকে নড়ব না; আমরা আমাদের নীতি মেনে চলব: প্রথমে আমরা শত্রুকে চূর্ণ করব, আর তারপর এখান থেকে সরে যাব।"

পার্টিসান সৈন্যরা আনন্দে চীৎকার করে বলল—"ঠিক! ঠিক! হুররে!"

আমরা ঘুমোতে গেলাম লড়াইয়ের জন্য পুরদস্তুর তৈরী হ'য়ে। শিবিরের চতুর্দিকে নতুন বাড়তি ঘাঁটি বসান হ'ল। খবর যোগাড় করার জন্য লোক পাঠান হল বেরেস্টিয়ানির দিকে। তাদের কেউ গেল ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা পায়ে হেঁটে।

সকাল বেলা সূর্য উঠেছে কি না উঠেছে এমন সময় ভলিয়া সেমিয়োনোভ বেরেস্টিয়ানির দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এল।

সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—"গ্রাম থেকে জার্মানদের মস্ত বড় একটা দল আসছে আমাদের ক্যাম্পের দিকে।"

ঠিক সেই সময় আমরা দূরে মেশিনগান আর টমিগানের আওয়াজ শুনতে পেলাম। শব্দটা হল প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে,—ব্যালিটস্কির ক্যাম্পের কাছাকাছি।

আমি ঘোড়ার পিঠে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলাম সেখানে, কি হচ্ছে সেখানে, সাহায্য দরকার আছে কিনা, তা জানবার জন্য আর আমাদের এখানেও আসতে পারে এই সব খবর দেবার জন্য।

এই সময় আমাদের দলে ছিল প্রায় সাড়ে সাতশ লোক। আমাদের দলটা ভাগ করা ছিল চারটে কম্যাণ্ডাণ্ট কোম্পানী আর দুটো প্লেটুনে: একটা স্কাউট (খবর জোগাড় করবার লোকের) প্লেটুন আর একটা হল গিয়ে কম্যাণ্ডারদের প্লেটুন।

বাজানভের অধীনে যে দলটা ছিল সেটা গেল বেরেস্টিয়ানির দিক থেকে যে সব শত্রু আসছিল তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। সেমিয়োনোভের অধীনে যে দ্বিতীয় দল ছিল, তাদের নির্দেশ দিলাম, শত্রুর পাশ কাটিয়ে শত্রুর গোলন্দাজ দল আর পরিচালনা কেন্দ্র ভাল ক'রে দেখে নিয়ে শত্রুকে পিছন থেকে আঘাত হানতে।

দ্বিতীয় দল ক্যাম্প ছেড়ে যাবার পর, ঘাঁটি থেকে খবর এল যে অন্যদিক

দিয়েও একদল জার্মান আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য চতুর্থ দলের এক অংশকে পাঠিয়ে দিলাম। এই দলের আর একটা অংশ আমাদের ডান দিকটা আগলে রেখেছিল। তিন নম্বর দল ক্যাম্পের চারপাশের ঘাঁটিগুলো রক্ষা করছিল।

কাজেই, আমাদের সমস্ত শক্তিই হয়েছিল কাজে জোড়া। রিজার্ভে আমাদের ছিল খবর দেনেওয়ালাদের একটা দল আর প্লেটুন।

সকাল দশটার সময় লড়াই শুরু হল। জার্মানরা এক নম্বর দলের ওপর মেশিনগান দিয়ে প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ করতে আরম্ভ করল। কামান আর মেশিনগানের গুলি বর্ষণের আড়ালে তারা একটা দৃঢ়সংবদ্ধ ব্যূহের আকারে এগুতে লাগল। আমাদের ছোট বড় মেশিনগানের পাল্টা আক্রমণে তারা থেমে মাটিতে শুয়ে পড়তে লাগল—কিন্তু সে কেবল অল্পক্ষণের জন্য। অল্প পরেই আমরা জার্মান ভাষায় সৈন্যদের প্রতি হুকুমের শব্দ শুনতে পেতে লাগলাম—তারপরেই শত্রু আবার উঠে আক্রমণ চালাতে লাগল।

জার্মানদের টমিগানের পাল্লার মধ্যে আসতে দিয়ে তারপর আমরা বাজের শব্দের মত "রে—রে" করে তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালালাম।

জার্মানদের দ্বিতীয় দলও আক্রমণ করল, চার নম্বর দলের এক অংশ তাদের রুখল।

আহতদের বয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

আমাদের গুলি-বারুদ যে কম আর আমরা যে একটানা বেশীক্ষণ ধরে লড়তে পারব না—এ আমরা জানতাম, তাই আমি ব্যালিটস্কি আর কারাসেভের দলের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদের বললাম যে তারা যেন শত্রুর পিছনের দিকে ছোট ছোট দল পাঠিয়ে দেয়, এতে শত্রুর কিছুটা শক্তিও অন্তত অন্যদিকে লড়াইয়ে আটকা পড়বে।

জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী আমাদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে গোলা চালাতে শুরু করল। কিন্তু শেলগুলো গিয়ে পড়ল দু'শ মিটার দূরে।

এক নম্বর দল খবর দিল, তাদের গুলি-বারুদ কমে আসছে এবং তাদের বড় মেশিনগানটার আর মোটেই গুলি বারুদ নেই। কম্যাণ্ডাণ্টের প্লেটুন থেকে একদল আমরা তাদের কাছে পাঠালাম। কিছুক্ষণ পরে তারা আবার খবর পাঠাল যে তাদের আর গুলি-বারুদ প্রায় নেই বললে চলে, এবং সাহায্য না পেলে তারা আর লড়াই চালিয়ে যেতে সমর্থ হবে না।

তাদের দুত বলল, "ওরা ফ্যাশিস্টদের ইঁদুরের মত মারছে বটে, কিন্তু তবু তারা আসছে তো আসছেই! আমাদের মানসিক অবস্থার ওপর আঘাত চালিয়ে ফ্রিৎস (জার্মান শত্রু) আমাদের ভয় পাইয়ে দিতে চায়।"

সেমিয়োনোভের দল চলে যাবার পর এখন প্রায় চার ঘণ্টা কেটে গেছে, কিন্তু সে কথা এতক্ষণ আর মনে ছিল না। ওরা কোথায়, আর কি-ই বা করছে?

যারা এতক্ষণ যুদ্ধ করছিল না, বিভিন্ন ইউনিটের তেমন কিছু লোক নিয়ে আমরা ছোট একটা দল এক নম্বর দলের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু এতে মাত্র অল্প কিছুক্ষণ চালান গেল।

দেখে মনে হতে লাগল আমরা বুঝি লড়াইয়ে হারছি।

ব্যালিটস্কি আর কারাসেভের কাছ থেকে সংবাদবাহকরা ফিরে এল। ব্যালিটস্কি খবর দিয়েছে যে সে কাউকে পাঠাতে পারবে না; একটা আক্রমণের আশঙ্কা করে তার দল প্রতিরোধ করবার জন্য ব্যূহ সাজিয়েছে। কিন্তু কারাসেভ লিখে পাঠিয়েছে শত্রুর পাশে আঘাত হানবার জন্য সে পুরো একটা ব্যাটালিয়ানকে পাঠাবে।

জার্মানরা দুদিক থেকে ক্রমে আরও জোর চাপ দিচ্ছিল। এখন তো গুলি বর্ষণ ক্যাম্পের খুব কাছেই হচ্ছিল। আমাদের শেষ রিজার্ভ বাহিনীও লড়াইয়ে চলে গেল। এরা হল কম্যাণ্ডাণ্ট বার্লাটেনকো আর পনের জন সামান্য আহত পার্টিসান—যাদের একটু আগে শুশ্রূষা করা হয়েছে।

এখন ক্যাম্পের উপর গোলা এসে পড়তে লাগল। বিরাট বিরাট পাইনগাছগুলো ভেঙে পড়ছে। জার্মানরা ক্রমেই আরও কাছে এসে পড়ছে।

যুদ্ধ চলছে সাত ঘণ্টা ধরে। কারাসেভের সৈন্যদের তো কোথাও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। সেমিয়োনোভের দলেরও না।

পাঁচটার কিছু পরে আমি মালপত্রের ট্রেন তৈরী রাখতে এবং তাতে গুরুতরভাবে আহতদের সদর ঘাঁটির জিনিসপত্রগুলো বোঝাই করতে নির্দেশ দিলাম। আহতদের মধ্যে কষ্টেসৃষ্টে এমন গুটি চোদ্দ লোক খুঁজে বার করলাম, যারা তখনও অস্ত্র ধরতে পারে। স্তেসারস্কি ও অন্য ডাক্তারদের ওপর আহতদের এবং মালপত্রের ট্রেনে পাহারা দেবার ভার পড়ল। কম্যাণ্ডাণ্টের প্লেটুনের বাদ বাকি সৈন্য নিয়ে আমি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে গেলাম লড়াই চালাতে

চালাতে সরে আসার নির্দেশ দেবার জন্য এবং মালপত্রের ট্রেন আর আহতদের স্থানান্তর করাটা শত্রুর সামনে থেকে আড়াল করে রাখবার জন্য।

এটা আমি বেশ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম যে, অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত যদি না যুঝে চলতে পারি তাহ'লে আমরা সরে যেতে পারব না। আমাদের চারদিকেই তখন জার্মানরা।

যে দিক থেকে জার্মানদের কামান থেকে আমাদের উপর গোলা বর্ষণ চলছিল, ঠিক সেইদিক থেকেই আমরা হঠাৎ স্পষ্ট শুনতে পেলাম রুশ ভাষায় একটা আনন্দধ্বনি—"হুররে!" আর এই "হুররে"-র আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই যেন এক যাদুর প্রভাবে গুলি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে জার্মানদের কামান থেকে আবার গোলা বর্ষিত হতে লাগল···এবার কিন্তু জার্মানদেরই বিরুদ্ধে।

সহসা বিদ্যুতের মত আশঙ্কা এবং ভয় এসে হিটলারী দস্যুদের অভিভূত করে ফেলল। তারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালাতে লাগল। আমাদের লোকেরা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করল।

এই অলৌকিক ঘটনাটা কি?

অবশ্য, এর মধ্যে সত্যিই কোন অলৌকিক কিছু ছিল না। সেমিয়োনোভের দলই আমাদের জয় নিশ্চিত করে তুলেছিল। শত্রুর পিছনে এসে পড়ে সেমিয়োনোভ তাড়াহুড়ো না করে—ঘুরে ঘুরে তাদের গোলন্দাজ-বাহিনী আর কামানের ব্যূহ বেশ ভাল করে দেখে; সে জানতে পারে যে শত্রুদের আছে তিনটে কামান, তিন ব্যাটালিয়ন মর্টার আর একটা দশ ব্যারেলের মর্টার, এবং তাদের নির্দেশ দেবার আর পরিচালনা করবার ঘাঁটি হচ্ছে সৈন্য সন্নিবেশের জায়গা থেকে দু'শ মিটার দূরের একটা তাঁবু।

তারপর সে তার দলকে দু' ভাগে ভাগ করে একই সঙ্গে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাল। একদল গিয়ে পরিচালনার ঘাঁটি দখল করল। আর দখল করল রেডিও স্টেশনটা; এরই মারফৎ যুদ্ধটা পরিচালনা করা হচ্ছিল। পিটুনি সৈন্যদলের উনিশ জন স্টাফ অফিসার আর তাদের অধিনায়ক জেনারেল পাইপার সেইখানেই নিহত হল। এইতেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেল।

এও বলতে হয় যে, কারাসেভের ব্যাটালিয়নও যুদ্ধ শেষ হবার আগেই এসে পড়েছিল। সে চালাকি করে শত্রুর পাশ কাটিয়ে আক্রমণ করল।

রাত যখন এগারোটা তখন লোকজন সব ক্যাম্পে এসে জমায়েত হল। তারা ছত্রভঙ্গ জার্মান সৈন্যদের খোঁজে তাদের পিছু পিছু বনের ভেতর ধাওয়া করেছিল। বেরেস্টিয়ানিতে প্রায় দেড়শ শত্রুসৈন্য আশ্রয় নিয়ে—আমাদের আক্রমণের প্রতিক্ষা করছিল। কিন্তু এখন আর আমাদের তাদের সঙ্গে লড়বার কোন মানে হয় না।

জার্মানরা যে পরদিনই নতুন সৈন্য নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে আর বিমান থেকে বোমা ফেলতে শুরু করবে এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম। রাত্রেই জানতে পারলাম যে, একদল জার্মান কিভার্টসি স্টেশন থেকে এগুচ্ছে। রাত ভোর হবার আগেই আমরা এ জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমাদের মধ্যে বারজন হল নিহত আর আহত হল বত্রিশ জন। নিহতদের কবর দিয়ে আহতদের পরিচর্যা করে আমরা যাবার জন্য তৈরী হলাম।

ব্যালিটস্কি আর কারাসেভের কাছে আমি লোক মারফত লিখে পাঠালাম যে ভোর হবার আগেই আমরা ক্যাম্প ছেড়ে যাচ্ছি এবং আমরা শত্রুর কাছ থেকে যে সব মালপত্র কেড়ে নিয়েছি, তারা তার ভাগ নিতে পারে।

আমরা প্রচুর মালপত্র লুঠে নিয়েছিলাম: শত্রুর একশ কুড়িটা গাড়ী ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর সাজ-সরঞ্জাম—তিনটে কামান, তিনটে মর্টার তাছাড়া প্রচুর মাইন আর শেল, টমিগান আর অনেক গুলিবারুদ।

শত্রুর যে সব সামরিক দলিলপত্র আমরা দখল করেছিলাম, তা থেকে জানা গেল আমরা জেনারেল পাইপারের অভিযাত্রী দল আর তিনটে এস. এস পুলিস ব্যাটালিয়নের সঙ্গে লড়ছিলাম; এতে ছিল প্রায় আড়াই হাজার লোক।

এই সব দলিল থেকেই জানা গেল যে, যুদ্ধ শুরু হওয়া ইস্তক জেনারেল পাইপার "শান্তিমূলক অভিযান" চালিয়ে আসছিল। হিটলারীদের অধিকৃত সব দেশেই সে আর তার এস-এস ব্যাটালিয়ন ঘুরেছিল। ইউক্রেনে তো সে পাঁচ মাস ধরে দাপাদাপি ক'রে ফিরেছে।

রাত যখন দুটো তখন আমাদের লোকরা খেতে পেল—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই তাদের প্রথম খাওয়া। তিনটের সময় আমরা ক্যাম্প ছাড়লাম। এমন ভাল বাসা ছেড়ে আবার শীতে জমে যাওয়ার জন্য আর জলে ভেজার

জন্য বাইরে বেরোন মোটেই সুখের নয়—কিন্তু এছাড়া করবারও তো আর কিছু ছিল না।

আমাদের দলকে আবার গুছিয়ে নেবার জন্য আর বিমানযোগে আহতদের মস্কো পাঠাবার জন্য আমরা স্থির করলাম যে, এবার আমরা রোভনো অঞ্চলের উত্তর অংশে যাব। এইখানে টুমানস্কি বলে আমি ছোট একটা দল রেখে গেলাম। এদের কাজ হল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া। পিটুনি সৈন্যদলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা আর রোভনো থেকে আমাদের দলের যারা আসবে তাদের অভ্যর্থনা করা।

আমরা চলে যাবার দুদিন পরেই জার্মানরা এখানে বোমা আর শেল ফেলতে শুরু করল। কিন্তু জায়গাটা তো তখন ফাঁকা জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়; "গোলা চালাবার জন্য ভাল করে তৈয়ার তাগাদা করে" জার্মানরা নিরুপদ্রবে ক্যাম্পে এসে হাজির হল। আর তারা ক্যাম্প ছেড়ে যাবার সময় তাদের "লুঠের মালপত্র" টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেল। সেই লুঠের মাল হল যুদ্ধে আমাদের হাতে নিহত ফাশিস্টদের মড়াগুলো। আর মড়াও বড় কম ছিল না; কমসে কম ছ'শ লোককে আমরা সাবাড় করেছিলাম।

হিটলারীরা জেনারেল পাইপারের মৃতদেহটা উড়ো জাহাজে করে বার্লিনে পাঠিয়ে দিল। ফাশিস্ট খবরের কাগজগুলো তার মৃত্যুতে কান্নাকাটি করল বটে—লিখল বটে যে দখলকারী কর্তৃপক্ষের সে ছিল একটা বড় খুঁটি,—কিন্তু তাকে আর তারা "সাক্ষাৎ যম" বলে উল্লেখ করল না।

—ডি. মেডভেডিয়েভ

'টাস' কর্তৃক প্রচারিত

আলোচনার জন্য

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা"

[পৌষসংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের আলোচনা।]

মানিক বাবুর প্রবন্ধটি বড় অদ্ভুত। যদি বলি তিনি প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন অমনি তার উল্টো কথাটাও ঐ প্রবন্ধ থেকেই দেখিয়ে দেওয়া যাবে। তিনি প্রকাশ রায়ের বক্তব্য রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা পড়ার পর মেনে নিয়েছেন আবার রবীন্দ্র গুপ্তের নির্দেশিত সাহিত্য বিচারের নিরিখ মেনে নিয়েও, যে ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহগুলি প্রগতিশীল সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিল তাদের ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ সম্বন্ধেই তিনি সন্দিহান : "ইতিহাসের বাস্তবতা বলপূর্বক ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের আদর্শ নিয়ে এরূপ গণবিদ্রোহ অসম্ভব করে দেয়"। (পরিচয়, পৌষ, পৃষ্ঠা ৩৮)। আবার নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধেও মানিক বাবু বলেছেন, "কিন্তু এ সব বিদ্রোহ ছিল আঞ্চলিক ও সীমাবদ্ধ এবং মূলত বৃটিশ শাসন উচ্ছেদ এ সব বিদ্রোহের আদর্শ ছিল না"। (ঐ)। তারপরে আবার "নীল বিদ্রোহ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, এ বিদ্রোহ ছড়ায় নি। অন্যান্য বিদ্রোহ সম্পর্কেও ঐ একই কথা"। (ঐ)।

ইতিহাসের বাস্তবতা বলতে মানিক বাবু কি বুঝেছেন জানি না ; তবে গণবিদ্রোহ যে বাস্তব ঘটনা এ কথা ত তর্কাতীত এবং সে বিদ্রোহ যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই হয়েছিল এ কথাও আজ ঐতিহাসিক সত্য। তবে হাঁ, সে বিদ্রোহ সার্থক হয় নি। সেই অসার্থকতার অনেক কারণের মধ্যে দেশীয় রাজন্যবর্গের দালালি, বিদ্রোহীদের অবিকশিত শ্রেণী চেতনা, সম্ভবত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আধা-সামন্ত জমিদারদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্বোপরি সিপাহীদের নিজেদের মধ্যেকার অনৈক্য ও খাস ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর তখনও ক্ষমতায় আসবার অসম্ভাব্যতা। মার্কস বলেছেন : "যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রেট বৃটেনে শ্রমিক শ্রেণী বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর স্থানে বসছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে ব্রিটিশ জোয়াল যতক্ষণ না

ছুঁড়ে ফেলছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর ইতস্তত ছড়ানো নূতন সমাজের উপাদানগুলিকে ভারতীয়েরা কাজে লাগাতে পারবে না। (India To-day—Page 92)।' * তাই সিপাহী বিদ্রোহের অসাফল্য ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ কি করে নষ্ট করে দেয় একথা বোঝা দুষ্কর।

সিপাহী বিদ্রোহের আগেও যে সাঁওতাল বিদ্রোহ মূলত ব্রিটিশ-বিরোধী সে কথা ব্রিটিশ বুঝেছিল বলেই অমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তারা মেতে উঠেছিল। কেন না ব্রিটিশের আওতায় জমিদার এবং মহাজনের যে বর্বর শোষণ এবং দাসপ্রথায় সাঁওতাল সমাজকে দগ্ধে মারছিল সেই বর্বরতাকে আক্রমণ করলে ব্রিটিশেরই গায়ে লাগে কারণ ঐ জমিদার মহাজনেরা ব্রিটিশ শোষণেরই মূল সহায় ছিল। ওরা গেলে কাদের সহায়তায় তারা শোষণ করত দেশকে ? এই সাঁওতালদের আবার সাহায্য করেছিল দেশের অগণিত চাষী এবং কারিগর। সাঁওতালেরা শুধু জমিই চায় নি, তারা আওয়াজ তুলেছিল যে তাদের স্বীয় দলপতিদের অধীনে স্বাধীন সাঁওতাল রাজত্ব 'চাই (মার্কসবাদী, ৬নং—পৃষ্ঠা ১৯৮ —Bengal gazettier for Santhal Parganas)। এর পরেও কি এই বিদ্রোহের শ্রেণী চরিত্র এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে ?

সাঁওতাল বিদ্রোহেরও আগে হয়েছিল সন্তান বিদ্রোহ ১৭৭২ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত। এই বিদ্রোহের বিকৃত, বুর্জোয়াসুলভ অপব্যাখ্যা দিয়েছেন বঙ্কিম আনন্দমঠে। এই বিদ্রোহও ছিল মূলত ব্রিটিশ-বিরোধী এবং সে বিদ্রোহও করেছিল বুভুক্ষু কৃষক সমাজ—মুসলমান টেক্স আদায়কারী রেজা খাঁর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে—যে ব্রিটিশ তখন নারকীয় লুটে ব্যস্ত। এই সন্ন্যাসীরা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কল্যাণীর প্রেমমুগ্ধ, হতাশ-প্রেমিক আত্মহননোন্মুখ ব্রাহ্মণ সন্তানেরা নয় : "১৭৭২ সালের শীতকালে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিম্ন বঙ্গের ফসলভরা ক্ষেতের উপর, পঞ্চাশ থেকে হাজার লোকের এক এক দল আগুন জ্বালাতে লাগল, লুটপাট করতে লাগল। কালেক্টরেরা ফৌজ ডেকে পাঠাল—কিন্তু সাময়িক কিছু সাফল্যের পর আমাদের সিপাইরা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হলো (মার্কসবাদী, ৬নং—পৃষ্ঠা ১৭৭)।

---

*মার্কস-এর এই কথাগুলি মনে রেখে British capital এর regenarating role এবং সেই সম্পর্কে এখানকার বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে প্রগতিবাদীদের আবার ভেবে দেখতে বলি।

এরা ধান দখল করছিল কার? লুটপাট করছিল কার সম্পত্তি? ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ সামন্ত শ্রেণীর—ফিউডাল সামন্ত শ্রেণীর; তখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নূতনতর শোষণব্যবস্থা চালু হয় নি। সন্ন্যাসীদের মনে স্পষ্টত ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের আদর্শ ছিল কি ছিল না এ কথা মার্কসবাদীর পক্ষে অবাস্তব। আসলে তার শ্রেণী চরিত্র এবং বাস্তব ভিত্তি কি ছিল সেইটাই বিচার্য।

নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে ঐ একই কথা আরও বেশী করে প্রয়োজ্য ১৮৫৯ সালে। ব্রিটিশ কারবারী মূলধনকে (British merchant capital) আঘাত করা মানেই ত ব্রিটিশ শাসনের অতি প্রকট শোষক রূপকে আঘাত করা। সেটা 'ছড়ায় নি' বলেই তার শ্রেণী চরিত্র এবং উদ্দেশ্য বদলে যাবে? আর ছড়ায় নি মানে কি? এত বড় চাষী ধর্মঘট বাংলা দেশে এর পরে এখনও পর্যন্ত হয়েছে কি? "এ ধর্মঘট এমনই ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, প্রায় ৫০ লক্ষ গরীব চাষী এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল"(মার্কসবাদী, ৬নং পৃষ্ঠা ১৬৪)। "নীল দর্পণ" এই বিদ্রোহের বিপ্লবী প্রতিরূপ নয়, শুধু জাগায় ঘৃণা ও বিক্ষোভ। অত্যাচারকে বড় করে তুলে ধরে, একথা সত্যি হলেও মূল কথাটা ত বদলায় না। দীনবন্ধু ব্রিটিশের প্রসাদপুষ্ট পেটি-বুর্জোয়া—তাঁর মন স্বভাবতই আপস করতে চায় শোষকের সঙ্গে। নীল দর্পণের এ দুর্বলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু তবু নীল দর্পণে অত্যাচারের যে প্রতিবাদ আছে তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এবং বাস্তবানুগ। তোরাপ যখন রোগ সাহেবকে মারছে তখন তাকে বারণ করছে ধনিক-জোতদার নবীন মাধব। তোরাপের শ্রেণীচেতনা যে সহজ প্রতিশোধের পথ নিয়েছে তাকে ব্যাহত করছে আপসকারী ধনিকের মনোবৃত্তি। কিন্তু তোরাপ ত একজন নয়; তোরাপ টাইপ। তোরাপদের জোরেই নীলকর রহিত হয়েছিল, শুধু মাইকেলের নীল:দর্পণ অনুবাদ করার ফলে নয়।

এখানে আরও যে জিনিসটা চোখে পড়ছে সে হচ্ছে বঙ্কিমের চরম সাম্প্রদায়িকতার পাশে দীনবন্ধুর একান্ত অসাম্প্রদায়িকতা: তোরাপ উদ্ধার করছে ক্ষেত্রমণিকে। এই দিক থেকেও দীনবন্ধু প্রগতিশীল বুর্জোয়া। ফিউডাল জাতিভেদ ও ধর্মভেদ প্রথাকে তিনি গভীর আঘাত দিয়েছেন এখানে—বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্র।

কিন্তু এই সব গণ-অভ্যুত্থান যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল মানিক বাবু

বলেছেন, "ঐতিহ্য হিসাবে তা প্রগতিবাদীর কাছে খুবই মূল্যবান কিন্তু সাহিত্যে এ সব বিক্ষিপ্ত" (ঐ)। সে সাহিত্য যদি বিক্ষিপ্তই হবে তবে তা ঐতিহ্য সৃষ্টি করবে কেমন করে? তবু তাকে মূল্যবান বলে মনে করছেন মানিক বাবু সে কি শুধু রবীন্দ্র গুপ্তের কথায়? রবীন্দ্র গুপ্ত হাতের কাছের কতকগুলির সন্ধান দিয়ে গবেষকদের উপর ভার দিয়েছেন সেই ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার, খুঁজে বের করবার ভার দিয়েছেন সেই সব আমাদের এখনও অজানা গণসাহিত্যের এবং ব্রিটিশ-বিরোধী প্রগতিশীল সাহিত্যের নিদর্শনের। সে জিনিস যে ছিল এবং সে ঐতিহ্যই যে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের হাতিয়ার এ বিশ্বাস মানিক বাবুর থাকলে তিনি আশান্বিত হয়ে বলতেন, হাঁ, আমি যে সাহিত্যিক, আমার দায়িত্ব তাকে খুঁজে বের করা। তিনি এ কথা কেন বুঝলেন না যে আপসকামী বুর্জোয়ারা গণ-আন্দোলনকে শুধু ধ্বংস করে না তার সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করে; জনমানসে সঞ্চারিত করে নিজেদের আপসী মনোবৃত্তি আর নানাপ্রকারের অদৃষ্টবাদী জীবনবেদ; মুছে ফেলবার চেষ্টা করে সমস্ত সংগ্রামী ঐতিহ্য। তখন গণ-সংস্কৃতি নিজে বাঁচবার চেষ্টায় নানাপ্রকার ছদ্মবেশ গ্রহণ করে; কখনও সেই সংস্কৃতির অংশবিশেষ বুর্জোয়া সাহিত্যিকের লেখাতেও খণ্ডিত, অপব্যাখ্যাত আকারে দেখা যায়; কখনও ধর্মীয় সাহিত্যের মারফত সেই ক্ষোভ বা গণ-আন্দোলন আধ্যাত্মিক স্তরের উন্মার্গে চলে; কখনও বা শোষক শ্রেণীর দেবদেবীকে পর্যন্ত মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে এনে বুর্জোয়া অধ্যাত্মবাদকে আঘাত করে কিন্তু নিজেও আবার পড়ে যায় সেই মোহে।

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার মারফত ইংরেজের চাকুরীর আশায় যে মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠল সেই মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের গণ-জীবন থেকে এত তাড়াতাড়ি নিজেকে সম্পর্কহীন করে তুললে আর ব্রিটিশ শোষণে গ্রামাঞ্চল এমনি মুমূর্ষু হতে থাকল যে, এই মধ্যবিত্তের আপসী সাহিত্যই যেন সমগ্র বাংলা সাহিত্য বলে পরিগণিত হল—মনে হল বঙ্কিম বুঝি ভুঁইফোঁড় বটগাছ। আর সেই ইংরেজি শিক্ষিত পেটি-বুর্জোয়ার সৃষ্টির মধ্যেই এখনও আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকবার জন্য আমরা শুধু দীনবন্ধু বা আর এক আধ জনকেই প্রগতিশীল ব্রিটিশ বিরোধী স্রষ্টার বিক্ষিপ্ত নিদর্শন বলেই মনে করছি। খুঁজে দেখবার যে বিপ্লবী চেতনা, যে চেতনার মধ্যেই আছে সত্যিকারের দেশপ্রেম তার একান্ত অভাব ঘটছে আমাদের মধ্যে।

আমাদের দেশে বুর্জোয়ারা,চিরকাল ইংরেজের সঙ্গে রফা করে"বেড়েই উঠেছে—এখন অবশ্য রাঘবাম্বিত বুর্জোয়ারা কংগ্রেসী আমলের ব্রিটিশ বিরোধিতার সেই পাতলা মুখোশখানাও খুলে ফেলেছে। এটা স্বাভাবিকই। স্টালিন বলেছেন, "বিপ্লবী আন্দোলন যত বাড়ে, এই সব দেশের (পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অগ্রসর) জাতীয় বুর্জোয়ারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়—বিপ্লবী শ্রেণী (পাতি বুর্জোয়ারা) এবং একটি আপসকামী শ্রেণী (বড় বুর্জোয়ারা)। এদের মধ্যে প্রথমটি বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যায় আর পরেরটি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই এক জোটে যোগ দেয়।" (Address to the University of the Toiles of the East—1925—Stalin)। আজকে তাই এখনও আমাদের লড়তে হবে সাম্রাজ্যবাদেরই বিরুদ্ধে প্রধানত; আমাদের দেশী "Big Bourgeoisie" Mountbatten এর আশ্রয়ে সেই সাম্রাজ্যবাদেরই তল্পীবাহক।

কিন্তু এ কথা মনে করলে খুব ভুল হবে যে এই ভারতীয় ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ারা কোনোদিন অন্যান্য স্বাধীন দেশের বুর্জোয়াদের মত সত্যিই প্রথম দিকে প্রগতিশীল ছিল। সে শুধু ব্রিটিশের দালালী করে কিছু সুবিধা করে নিতে চাই ছিল। রজনী পাম দত্তই বলেছেন **এদের মুখপাত্র** National Congress এর আদিযুগের সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে: "প্রতিষ্ঠাতাদের ছকা পথেই বিশ বছর ধরে জাতীয় কংগ্রেস বেড়ে উঠেছে। এই বিশ বছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কোন মৌলিক দাবী অর্থাৎ জাতীয় কোন দাবীই তার প্রস্তাবাবলির মধ্যে স্থান পায় নি;শুধু ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে আরও একটু ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবিই করা হয়েছে। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯০১ সালে নিম্নলিখিত ধারায় **ভারতীয় জনগণের** দাবি উপস্থাপিত করেছিলেন: ভারতীয়েরা হঠাৎ পরিবর্তনের এবং বিপ্লবের পক্ষপাতী নয়। তারা নতুন শাসন ব্যবস্থা চায় না।......তারা প্রদেশের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় সভ্য দেখতে চায়।" (India to-day —R. P. Dutta—Page 299 Revised edition)। এই মৃদু চাওয়া ও পাওয়া বুর্জোয়াদের দুর্বলতারই চিহ্ন। তারা জানত, 'প্রথম যুগের ভারতীয় বুর্জোয়ারা ভালো করেই বুঝত যে তাদের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব নয়। তারা বরং ব্রিটিশ শাসনকে মিত্র বলেই মনে করত (India to-day—Revised Edition—Page 300)।

এই বুর্জোয়াদেরই মুখপাত্রদের সৃষ্ট সাহিত্য ব্রিটিশ-বিরোধী অর্থে প্রগতিশীল হতে পারে না; এবং সেইজন্যেই কোনো অর্থেই হতে পারে না। পরাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনে কোনো প্রগতি আনাই সম্ভব নয় কারণ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে জীবনের বাস্তব উন্নতি সম্ভব সেই ব্যবস্থাই ত বিদেশীদের হাতে; তারা দেশকে পঙ্গু থেকে পঙ্গুতর করতেই ব্যস্ত। জীবনে প্রগতি না থাকলে সাহিত্যে কি করে থাকবে? সাহিত্য কি আকাশ কুসুম? তবু এই বুর্জোয়ারা কিছু শক্তি সঞ্চয় করে প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝে ব্রিটিশকে একটু চাপ দিয়ে ১৯১৯ এ সামান্য পার্লামেণ্টারী সংস্কার আদায় করেছিল। কিন্তু "১৯১৯-১৯২২ সালের প্রথম বিরাট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে জাতীয় বিপ্লবের ধ্বংসতেই পরিণতি লাভ করল। এই বিশ্বাসঘাতকতা তারা করল প্রধানত বর্ধমান কৃষি-বিপ্লবের এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে মজুরদের ধর্মঘটের ভয়ে" (Revolutionary movement in the colonies and Semi colonies—Thesis of the :Sixth Congress of the Communist International 1928—Page 4)। তাই এরা নিজেদেরই স্বার্থে আমাদের সংগ্রামী ব্রিটিশ-বিরোধী ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের থেকে জাত এক জাতীয় আপসী সাহিত্যকেই বিপ্লবী জাতীয় সাহিত্য বলতে শিখিয়েছে।

২

কিন্তু এহো বাহ্যঃ। মানিক বাবুর আসল কথা আগের আলোচনার মধ্যে ধরা পড়ে নি। তিনি প্রকাশ রায়কে সমালোচনা করে বলেছেন যে তিনি বামপন্থী বিপ্লববাদকে ('চোরা সংস্কারবাদ') যথেষ্ট আক্রমণ করেন নি এবং আজকের দিনে যে প্রগতিকামীদের মহলে কথা উঠেছে, প্রগতিশীল সাহিত্যিককে জনগণের সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে, সেটা এই বামপন্থী বিপ্লববাদেরই প্রকাশ। এই সম্পর্কে মানিক বাবু গত প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের ইস্তাহার রচনা নিয়েও কতকগুলি কথা বলেছেন যেগুলি সেই সম্মেলনের ইস্তাহার পুনর্লিখন-কমিটির সভ্য হিসাবে তাঁর বলা ঠিক হয়েছে কি না তাঁকে ভেবে দেখতে বলি। আগে সেই কথাটাই একটু আলোচনা করা যাক।

ইস্তাহারের প্রথম খসড়াতে বুর্জোয়া সাহিত্যের স্বর্ণযুগের প্রশস্তিমূলক মুখবন্ধে আমাদের কারও কারও তীব্র আপত্তি ছিল দুটি কারণে: (১) ওটাকে স্বর্ণযুগ বলেই আমরা স্বীকার করতে পারি নি; (২) আর গণসাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ এবং পন্থা যে খসড়ায় থাকবে তাতে ঐ রকমের প্রশস্তি এই বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে যে সেই স্বর্ণযুগ থেকে আমাদের পতন ঘটেছে —আমরা তারই আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছি। মানিক বাবু নিজে কমিটির সভায় বলেছিলেন, 'কেন, বুর্জোয়ারা কি সমগ্র জাতির জন্যেই সৃষ্টি করে নি? তাদের আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হই নি? আমরা তখন নিজেরা আমাদের দেশের পরাধীন যুগের সাহিত্য বিচারের নিরিখ সম্বন্ধে কমবেশী বিভ্রান্ত ছিলাম বলে তাঁকে স্পষ্ট করে বলতে পারি নি আমাদের আপত্তিটা ঠিক কোথায়; তবু বঙ্কিম, রামমোহনকে আমাদের সংগ্রামী সংস্কৃতির পথকর্তা হিসেবে কিছুতেই দেখতে পারছিলাম না। আজ মানিক বাবু বলছেন বঙ্কিমকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলেই জানতেন। তখন কিন্তু সে কথা আমাদের না জানিয়ে এবং খসড়াকে যথাযথ করবার কাজে নিজের দায়িত্ব পালন না করে, আজ বামপন্থী বিপ্লববাদের কাঁধে দোষ চাপানোকে আমরা তাঁর স্রষ্টামানসে অন্য এক বিচ্যুতির আভাস বলে মনে করছি। সেটি পাতি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদ।

শ্রমিক শ্রেণীর দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনধারা থেকে সমাজবাদী চেতনার আপনা আপনি উদ্ভব হয় না, সে চিন্তা সেখানে জাগিয়ে দিতে হয় এবং সেই চেতনার উন্মেষে, দরদী বুর্জোয়া লেখকদের মুর্খ শ্রমিকদের জন্যই লেখা জলো সাহিত্যের বদলে বুর্জোয়াদের সাধারণ সাহিত্যই বেশী প্রয়োজনীয় কেন না তাতে বুর্জোয়ারা নিজেদের সত্য প্রতিরূপই আঁকে এবং তাদের পক্ষে যতখানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার করা সম্ভব তা করে—লেনিনের এই উক্তি থেকে মানিক বাবু এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বুর্জোয়া লেখক 'শ্রেণীবিচ্যুত' না হয়েই, শ্রেণী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেই, প্রগতিশীল গণসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। অথচ তিনি শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা গণসাহিত্যিকের পক্ষে অবশ্য অর্জনীয় বলে মনে করেন। মানিক বাবু সাহিত্যিকের শ্রেণীবিচ্যুতি সম্পর্কে 'বামপন্থী বিপ্লববাদকে' সমালোচনা করে বলেছেন "মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে লড়াইয়ে নেমেছেন এবং নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তাঁদের

নিষেধ করে দেওয়া হয় যে সংস্কৃতি-চর্চা তোমাদের কাজ নয়। এ শুধু শ্রমিকে পরিণত বুদ্ধিজীবীর কাজ" (পরিচয়—পৌষ)। শ্রেণীবিচ্যুতি মানে তিনি কেন যে শ্রমিকে পরিণত হওয়া মনে করলেন তা বোঝা খুব দুষ্কর। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন—কেউই শ্রমিক ছিলেন না এবং নন, গর্কিও ঠিক শ্রমিক ছিলেন এ কথা বলা চলে না; আমেরিকার Theodore Dreiser শ্রমিক ছিলেন না; এখন যাঁরা আমেরিকায় প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রভৃতি, তাঁরাও কেউ শ্রমিক নন। তবে শ্রমিক হতে বলা হয়েছে এ কথা মানিক বাবু ভাবলেন কেন? শ্রেণীবিচ্যুতি মানে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনবেদের সঙ্গে একাত্মতা, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে যে শোষণের অবসানে বিশ্বাস এবং নিজের ব্যক্তি মানসকে বুর্জোয়া জীবনবেদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শোষিত জনের সংগ্রামকে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখা। মানিক বাবুকে আশ্বাস দিচ্ছি তাঁকে শ্রমিক হতে হবে না কেন না শ্রমিক হলেই সাহিত্য লেখা যায় না।

আসল কথা একাত্মতা। সে কথা মানিক বাবুও স্বীকার করেন। আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের যে ঢেউ উপনিবেশে, আধা-উপনিবেশে ও ভুয়া স্বাধীন দেশগুলিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী; ভারতবর্ষ সেই সংগ্রামে আজ সামিল; শ্রমিক শ্রেণী এখানেও নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তার নেতৃত্ব ভিন্ন মুক্তি সম্ভব নয় কেন না সে শুধু যে সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী তাই নয়, সেই আজ সাম্রাজ্যবাদী আর তার তল্পীবাহক দেশীয় রাঘববোয়ালদের দ্বারা সবচেয়ে বেশী শোষিত। আর এ কথাও মনে রাখা দরকার যে আজকে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করা মানেই দেশীয় শোষকদেরও খতম করা। বিপ্লবকে সেই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী; আর সকলেই তার নেতৃত্ব ভিন্ন নানান দ্বিধায় পেছ-পা হবে, বিশেষ ক'রে পাতি-বুর্জোয়ারা। পাতি-বুর্জোয়ারা কি ক'রে বিপ্লবকে বানচাল করে তার দৃষ্টান্ত আজকের দিনে Peoples' democracy-গুলিতে অপ্রতুল নয়। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি থেকে এই সব বিপ্লব-ভাঙাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে।

এই রকমটা হওয়ার কারণও খুব স্পষ্ট। পাতি-বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া জীবনদর্শনে আকণ্ঠ নিমগ্ন; নেহাৎ শোষণের চাপে তারা ক্রমান্বয়ে দরিদ্রতর

হতে থাকে ; এদিকে তারা দেখে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই। অবস্থা বিপর্যয় তাদের নিয়ে আসে শ্রমিক শ্রেণীর শিবিরে। কিন্তু অনেকে মানসিক একাত্মতা বোধ করেও আসে, শুধুমাত্র অবস্থার চাপে প'ড়ে নয়। বিপ্লবের অগ্রগতি এইসব বুদ্ধিজীবী পাতি-বুর্জোয়াদের জীবনের শেষ বুর্জোয়া মোহটুকুও ভেঙে দেয়—কলাকৈবল্যবাদ, বুদ্ধিজীবীদের শ্রেষ্ঠতা, শ্রমিকদের প্রতি কৃপা— ইত্যাদি যে সব ভাব মনের গহনে লুকিয়ে থাকে, সেগুলিও ভেঙে যায় শ্রেণীসংগ্রামের তীব্র রূঢ়তায় ; বুর্জোয়া জীবনের স্বচ্ছন্দ বিলাস, লিখবার জন্য অবসরের নামে মনন-বিলাস, শ্রমিক শ্রেণীকে শেখাবার সাধু আগ্রহ— এ সবও একের পর এক পড়ে ভেঙে। মানিক বাবু যদি এ কথা ভেবে থাকেন যে সাম্যবাদী চেতনা বাইরে থেকে আসে মানে পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধি- জীবীরা তা আগে আয়ত্ত ক'রে শ্রমিকশ্রেণীকে শেখায়, তাহলে কিন্তু লেনিনের কথা ভুল বোঝা হবে, তার অপব্যাখ্যা করা হবে। বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীই করে। কি রকম ক'রে সেই শ্রমিক শ্রেণীসচেতন সংগ্রামী হয়ে ওঠে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গর্কির মা উপন্যাসের নায়ক প্যাভেল। পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পাতি-বুর্জোয়া থেকেই শুধু বুদ্ধি দিয়ে মার্কসইজম বুঝে ফেলবেন—মানে শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে সব তত্ত্ব এবং তথ্য আয়ত্ত ক'রে নেবেন—এ হয় না। রোমা রোলাঁকেও সংগ্রামে নামতে হয়েছিল।

মানুষ সৃষ্টিশীল জীব বলে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুদ্ধি দিয়ে যেটা বোঝে সেটাকে আবার কাজের মধ্যে দিয়ে তত্ত্বকে সম্পূর্ণতর ক'রে আরও বৃহত্তর তত্ত্বের দিকে এগিয়ে চলে। কর্মই হচ্ছে তত্ত্বের পরিপূরক এবং নিরিখ। কর্মহীন মনন জীবনে কোনো কাজেই আসে না। তাই মার্কস বলেছিলেন, 'দার্শনিকেরা বহু প্রকারে জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন ; কথা কিন্তু হল জগৎকে পরিবর্তিত করা।' অর্থাৎ যতক্ষণ কেউ কাজ না করছে ততক্ষণ তার তত্ত্বের কোনো কার্যকারিতা আছে কি না বোঝা যাবে না ; কার্যকারিতা না থাকলে সে তত্ত্ব তত্ত্বই নয়। আর কর্মসম্পর্কহীন তত্ত্বই বাধায় যত অকারণ বুদ্ধির কচকচি। মানুষের আসল জ্ঞান আসে কর্মের থেকে। পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের যে ঘাত-প্রতিঘাত কর্মের মধ্য দিয়ে হয়, তারই ফলে আসে জ্ঞান। নিরালম্ব মনন থেকে জ্ঞান আসে না। এই হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের গোড়ার কথা। সংস্কৃতি-সৃষ্টির মূল যেহেতু জীবন সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান যেহেতু কর্ম ভিন্ন আসে না সেখানে সাহিত্যিক যদি বলেন—শুধু মননের

মধ্য দিয়েই আমার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঐকাত্মতা আসবে তাহলে তিনি মার্কসিজম-লেনিনিজমকেই অস্বীকার করেছেন এবং পেটি-বুর্জোয়াসুলভ অহমিকা প্রকাশ করছেন। তিনি জীবনযাপন করবেন পেটি-বুর্জোয়ার, সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শ্রেণীবিচ্যুত হবেন না অথচ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করবেন শুধু কল্পনার সাহায্যে আর সেই কল্পনার সাহায্যে করবেন এমন সাহিত্য সৃষ্টি যা সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীকেও উদ্বুদ্ধ করবে—এ একেবারে উদ্ভট কথা এবং শ্রমিকশ্রেণীকে অপমান করা। সংগ্রামে অংশগ্রহণ ক'রে বাস্তব জীবনে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা না অর্জন ক'রে সাহিত্যে সেই সংগ্রামকে শুধু নয়, সংগ্রামের ভবিষ্যৎ পরিণতিকেও আভাসিত করা—এ সাধ্য কল্পনার নেই। বাস্তব জীবনের দ্বারাই মানুষের মন নিয়ন্ত্রিত। তাই মার্কস বলেছেন, 'মানুষের চেতনা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না ; বরং সামাজিক জীবনই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে (Historical Materialism—Marx & Engels Page, 1)।

শ্রেণীসংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলে সাহিত্যিকের চেতনায় সে সংগ্রাম এবং তার পরিণতির রূপ প্রতিভাত হবে কেমন করে? শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করবার একমাত্র পথই হল সংগ্রামে আসা এবং শ্রেণীবিচ্যুত হওয়া। তাই মায়াকোভস্কিকেও পোস্টার লিখতে হয়েছিল ; গ্লাডকভ তাই শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন সিভিল-ওয়ারের আগে ও পরে ; গর্কির ত কথাই নেই ; এই সেদিন হাওয়ার্ড ফাস্টও জেল খেটে এসেছেন ; পাবলো নেরুদার জীবনই ত এখন শুধু যুদ্ধ। আর যে চীনের আজকের বিজেতার রূপ দেখে মানিক বাবু সেখানকার সাহিত্যিকদের শত্রুকে 'মূল আঘাত' হানার সুযোগ দেবার জন্যে কালিকলম ছাড়াতে রাজী হয়েছেন, সেই চীনেই ১৯৩৭ সালে মাও সে-তুং লেখকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কৃষকদের মধ্যে যেতে বলেছিলেন ; সেখানেও সাহিত্যিকদের চীয়াং-এর ফাশিস্ট শাসন সহ্য ক'রেই সৃষ্টি করতে হয়েছে সাহিত্য ; সেই ফাশিস্ট শাসনকে ফাঁকি দেবার জন্যেই সেখানে Wood-cut-এর আবির্ভাব। বুর্জোয়াদের প্রচার সেখানে আজ স্তব্ধ হয়েছে আর এখানে সেটা পুরোদমে চলছে বলে সাহিত্যিক কি কল্প-বিলাস করলেই বুর্জোয়াদের ঠেকাতে পারবেন? বুর্জোয়াদের প্রভাব দূর করতে হলে তাঁকে সংগ্রামী সংস্কৃতি সৃষ্টি করে

জনগণের কাছে পৌছে দিতে হবে। বুর্জোয়াদের প্রভাব ধ্বংস করতে হবে বলে কলকাতায় বসে ধর্মঘটের ছবি আঁকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে কিছু লাভ নেই। সংগ্রামে অনেক প্রগতিকামী লেখক আসতে পারছেন না বলে সংগ্রামে না এলেও চলবে—এ সুবিধা দেওয়া চলে না। মানিক বাবু বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও দেখাতে পারবেন যে, সক্রিয় প্রতিরোধে আসেন নি এমন মানুষ উঁচুদরের বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন? তিনি নিজে 'চিহ্নের' পর আর এগোতে পারছেন না কেন? কেন কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানা, মৈমনসিংহে এত রক্ত ঝরলেও আমাদের সাহিত্যিকদের কলম দিয়ে সেই সব বীর যোদ্ধাদের জন্যে এক কলম কালি ঝরে না? কেন আজ দেশের চারিদিকের বিপ্লবীর স্ফুলিঙ্গ আমাদের শ্রমিকের সঙ্গে 'একাত্ম' সাহিত্যিকদের আত্মায় আগুন ধরাচ্ছে না? শুধু পারি বললে ত হবে না—করে দেখিয়ে দিতে হবে। আমরা বলছি, মার্কসইজম বলছে, ঘরে বসে সংগ্রামী সাহিত্য হয় না।

এ সংগ্রামের বহু রূপ আছে। সবাইকেই কালিকলম ছেড়ে বন্দুক ধরতে হবে এমন কোনো কথা নেই। চিন্মবাবু তা ঠিক বলেনও নি; তিনি বলেছেন সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: এই কলকাতা শহরে এতদিন আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের নাকের ডগা দিয়ে 'মানদণ্ড' দণ্ড ঘুরিয়ে গেল। যাঁরা শ্রমিকগত আত্মা, তাঁদের কোনও প্রতিবাদ হল এর বিরুদ্ধে? শুধু পরিচয়ে একটি সমালোচনা বেরুল। কেন আমাদের প্রগতিবাদীরা সভা ক'রে, পিকেটিং করে, হাণ্ডবিল দিয়ে, এমন কি সিনেমা হলের মধ্যে ঢুকে ছবি চলাকালীন প্রতিবাদ করে, সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না? এইভাবে পারতেন না তাঁরা বুর্জোয়াদের লোকের মনে এই বিষ ঢুকিয়ে দেবার প্রচেষ্টার উপযুক্ত জবাব দিতে। এতে কি বন্দুক ধরতে হয়, না কালিকলম ছাড়তে হয়? একেই বলে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এর মধ্য দিয়েই আসে জনমানসের সঙ্গে পরিচয়, আসে সামূহিক বৈপ্লবিক চেতনা। সাহিত্যিক সোজা বুঝতে পারে কেমন ক'রে লোকে তাকে গ্রহণ করছে এবং সেই বোঝার মধ্যে দিয়ে তার আত্মোন্নতি ঘটে, সে আরও বাস্তবমুখী হয়।

৩

কিন্তু এহো বাহ্য। মানিকবাবু সাহিত্যের শ্রেণীচরিত্রই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন সাহিত্য শ্রেণী-নিরপেক্ষ—সকল শ্রেণীর জীবনের নিরপেক্ষ রূপায়ন। বামপন্থী বিপ্লববাদীরা তাঁর মতে প্রগতিসাহিত্যকে 'মুচড়ে' বিপথে চালিত করতে চাইছে: 'সে মোচড়টা কি? শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুবাদী জীবনদর্শনের পরিবর্তে সমাজবাদী চেতনা ও সকল শ্রেণীর শ্রেণী সম্পর্কগত বাস্তবতার পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা ও শ্রমিকজীবনের বাস্তবতাকে প্রগতি সাহিত্যের উপজীব্য ব'লে দাবি তোলে।' তারপর আবার, 'আবেগ বা অনুভূতিরও শ্রেণীরূপ আছে। কিন্তু সাহিত্য কোন শ্রেণীগত আবেগ বা অনুভূতির রূপায়ন নয়। সাহিত্য......সমস্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আবেগ বা অনুভূতি এবং চেতনাকে (অনুভূতি ও চেতনা পৃথক কিন্তু পরস্পর নিরপেক্ষ নয়) প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটা সামগ্রিক জীবনদর্শনকেই রূপায়িত করে।' সামগ্রিক জীবনবেদের বুর্জোয়া ধুয়া তোলার পর আবার তিনি বলছেন, 'আসল কথাটা জীবনদর্শন: বুর্জোয়া জীবনদর্শন সাহিত্যকে বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূল করে, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শনই সাহিত্যকে শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল করতে পারে।' (পরিচয়—পৌষ)।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্যও শ্রেণীসংগ্রামের রূপায়ন: 'অতীত ও বর্তমানের সমস্ত মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাস।...শ্রেণী সম্পত্তির লোপকেই বুর্জোয়ারা যেমন উৎপাদনের লোপ বলে মনে করে তেমনি শ্রেণী-সংস্কৃতির লোপকে তারা সমস্ত সংস্কৃতির লোপ ব'লে মনে করে। ...প্রতি যুগেই শাসক শ্রেণীর ভাবনাধারণাই প্রধান স্থান দখল করে।' (কমিউনিস্ট ইস্তেহার—মার্কস্ ও এঙ্গেলস)। বুর্জোয়া সাহিত্যিক শ্রেণী-সংগ্রাম করে বুর্জোয়ার ভাবধারা সাহিত্যের মারফত প্রচার করে এবং তাকেই চিরন্তন ভাবধারা বলে জাহির করে। এই প্রচার রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদ থেকে আরম্ভ করে বনফুলের মানদণ্ডে সোজাসুজি মালকোচা মেরে হাত গুটিয়ে বলা—ক্যাপিটালিস্টকে যে খারাপ বলে সে খারাপ কমিউনিস্ট। এই বুর্জোয়ারাই আবার নিজেদের সাহিত্যের শ্রেণীরূপ ঢাকবার জন্যে Art for art's sake থেকে রসো বৈ সঃ-তেও পৌঁছেছে—অর্থাৎ কোনো রকমে শ্রেণীশোষণের রূপকে, জেনে না জেনে, চাপা দিয়ে শ্রেণী-সংগ্রামকে স্তিমিত করাই এদের উদ্দেশ্য। বুর্জোয়া সাহিত্যিকও যে আবার

তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠে জনগণের জীবনকে রূপায়িত করেন না তা নয়। তবে সেও ঐ শ্রেণীসংঘর্ষেরই রূপ—জনগণ নিজেদের অধিকার যত সুপ্রতিষ্ঠিত করছে তত তারা সাহিত্যেও তাদের আসন দখল করছে।

তাই মানিকবাবু যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে, বিপ্লবের সহায়তা করতে চলেছেন তখন শ্রমিক-শ্রেণীর যে জীবনবেদ তাকেই ত একমাত্র প্রগতিশীল বিপ্লবী জীবনবেদ বলে মানতে হবে এবং 'সকল শ্রেণীর শ্রেণী সম্পর্কগত বাস্তবতাকে রূপায়িত' করতে হবে সেই জীবনবেদের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই সাহিত্যিক হচ্ছেন Partisan; তাঁর সৃষ্টি শ্রমিকশ্রেণীর 'শ্রেণীগত আবেগেরই' রূপায়ন। সেই আবেগই ত আজকের দিনে একমাত্র সার্থক সামাজিক সত্য যা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ শোষণহীন সমাজের পথে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য সব শ্রেণীকে প্রগতি-শীল সাহিত্যিক দেখবে এই বিপ্লবী আবেগ নিয়ে। তবেই ত অন্য সব শ্রেণীর আজকের দিনের সমাজে ঠিক ঠিক অবস্থানটি ধরা পড়বে। তাই 'সামগ্রিক জীবনদর্শন' দিয়ে সব শ্রেণীকে প্রভাবিত করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী জীবনদর্শন দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবন-দর্শনকে পরাস্ত করে, সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে সাহায্য করে শ্রেণীহীন সমাজের পথে মানুষকে অগ্রসর ক'রে দেবেন। তাই তাঁর সাহিত্য যদি Partisan না হয় তবে সে শুধু নিরপেক্ষ, সামগ্রিক রূপায়নের অজুহাতে বিপ্লবকে বানচাল করবে—কেন না জীবন নিরপেক্ষ নয়, সামগ্রিকও নয়। জীবন শ্রেণী বিভক্ত এবং খণ্ডিত। এখানে সামগ্রিকতার মোহ সৃষ্টি করা, সকলশ্রেণীর মুখপাত্র হবার চেষ্টা করা এবং সমাজবাদ না এলে সমাজবাদী চেতনা আসবে না এই যান্ত্রিকতার প্রশ্রয় দেওয়া তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের যুগে বুর্জোয়া প্রচারের কাছে পরাস্ত হওয়ারই নামান্তর।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর জীবনবেদের আলোকে শ্রেণীসংগ্রামকে রূপায়িত করার অর্থ শ্রমিকজীবনের ফোটোগ্রাফি নয়। সাহিত্য যে ফোটোগ্রাফি নয় এ কথা আজ আর আলোচনার স্তরে নেই। রিয়ালিজম বা বাস্তবানুগতা ঘটনাপ্রবাহকে এমন ক'রে রূপায়িত করে যাতে সমস্ত বিচিত্র ঘটনার মৌলিক সত্যটা ফুটে ওঠে এবং সেই সত্যেরই গতি সাহিত্যভাণ্ডারের স্রষ্টার সৃষ্টিতে। সেই সত্য বোঝার মূলে আছে যথাযথ জীবনদর্শন—

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এর আগের আগের যুগের সাহিত্যিকেরা অনেকে বস্তুবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু যান্ত্রিক বস্তুবাদকে গ্রহণ করার ফলে তাঁরা বস্তুর স্বতোগতির মধ্যে মানুষের সৃষ্টিশীলতা এবং মানুষের বস্তুকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন না থাকায় হয় ন্যাচারালিজমের পাঁকে (ফ্লবেয়ার, জোলা) না হয় ত বর্তমান একজিস্টেন্সিয়ালিজমের হিমে পড়ে ধুঁকেছেন বা ধুঁকছেন। এঁরা মানুষকে পরিবেশের হাতে মোটামুটি পুতুল হিসেবে দেখেছেন (যথা 'পুতুল নাচের ইতিকথা')—লক্ষ্য করেছেন জীবনে শুধু হতাশা আর ক্লেদ আর মলিনতা এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে শুধু ধ্বংসশীল জীবে পরিণত করেছেন। এ বিষয়ে জোলা আর সাত্রঁ এবং মালরোর নাম করলেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে। তবে ন্যাচারালিজমে জীবনের সত্যিকারের মলিনতা অনেকখানি ধরা পড়ে; অন্যটিতে মানুষকে পশুতে পরিণত করা হয়। এঁরা বুঝতে পারেন না যে, সভ্যতার ইতিহাসই হচ্ছে প্রকৃতির উপর মানুষের জয়ের এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতার ইতিহাস। সৃষ্টিশীলতার ফল হল প্রগতি এবং প্রত্যেক যুগের সাহিত্যেও জনমানসের নিকটবর্তী সাহিত্যিক তাঁর অজ্ঞাতেই এই প্রগতিকেও স্বীকৃতি জানিয়েছেন—যেমন চসার, সেক্সপিয়ার, টলস্টয়, কালিদাস এবং এ যুগে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত। তবু দুঃখের চেতনাই যে এ পর্যন্ত সাহিত্যিকের চেতনাকে ঘিরেছিল তার কারণ সোশালিজম আসার আগে পর্যন্ত মানুষ যত রকম সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এসেছে সবগুলিরই ভিত্তি কোনো না কোনো রকমের শোষণ। তাই সাহিত্যেও তার প্রতিফলন; কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সেইজন্যে সাম্যবাদকে ইতিহাসের অভূতপূর্ব উদ্‌গতি বলা হয়েছে: 'যে আকারেই হোক না কেন, অতীতের সমস্ত যুগে, সমাজের এক অংশ অপরকে শোষণ করে এসেছে। এখানে তাদের ঐক্য। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে সমস্ত যুগের সামাজিক চেতনা (বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও) এক খাতেই প্রবাহিত হয়েছে এবং এই খাতেই চলতে থাকবে যতক্ষণ না পৃথিবীর উপর থেকে শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়।

আবহমান কালের সম্পত্তির অধিকারের উপর গ'ড়ে ওঠা সামাজিক সম্বন্ধগুলির সঙ্গে সাম্যবাদী বিপ্লব এক চরম সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাবে। যদি এর ফলে আমাদের আবহমান কালের ভাবলোকেও এক বিপর্যয় ঘটে তাতে কি আশ্চর্য হবার কিছু আছে?' (কমিউনিস্ট ইস্তেহার)।

বর্তমানের সাহিত্যিক বুঝতে পেরেছেন এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে যে, ইতিহাস শুধু শ্রেণীসংঘাত ও শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় তাই নয়, বিংশ শতাব্দীতে প্রগতির বাহক হল শ্রমিকশ্রেণী কেন না তার শ্রেণী-সংগ্রামই শোষণহীন সমাজ তৈরী করতে চলেছে। এ শ্রমিক কেমন শ্রমিক : শোষিত শ্রেণীর মধ্যে যে শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ, শৃঙ্খলানুবর্তী, যুগ যুগের শ্রমিক সংঘাতে যার মন দৃঢ় হয়েছে, যে পুঁজিবাদী বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের যুগের সমস্ত নাগর সভ্যতা আত্মসাৎ করেছে এবং যার এই সমস্ত ঐশ্বর্যকে রক্ষা করবার, সঞ্চয় করবার এবং আরও উন্নত করবার, সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী আর জনগণের মধ্যে এই ঐশ্বর্যকে পৌছে দেবার ক্ষমতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আছে; শুধু যে শ্রেণী জানে কেমন করে সইতে হয় সমস্ত ভার, অত্যাচার, দুর্ভাগ্য; পুরনোকে ভেঙে ফেলে নূতন ভবিষ্যৎ রচনার পথ খুলে দেবার সাহস থাকার জন্য যার উপর ঐতিহাসিক নিয়মে এসে পড়ে বিশাল স্বার্থত্যাগের দায়িত্ব; শুধু যে শ্রেণী শ্রমের ক্লেশসাধ্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসার ফলে জানে কেমন করে প্রত্যেক মেহনতী মানুষের মনে নিজের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে হয়—শুধু এই শ্রেণীই অন্যান্য শোষকশ্রেণীকে পর্যুদস্ত ক'রে নিজের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে (Lenin. quoted in Text book of Marxist Philosophy, Page 79)।

এই শ্রেণীসংগ্রামে সাহায্য করাই হল সাহিত্যিকের কাজ। শ্রমিক-জীবনের যে সব দিক ক্ষয়িষ্ণু, যে সব অভ্যাস তাকে পূর্বতন ক্লিন্ন জীবনেই আটকে রাখতে চাইছে; তার রুদ্ধ সৃষ্টিশীলতা ব্যাহত হয়ে মনের মধ্যে আবর্ত রচনা করে তাকে যে কোনও রকমের হুল্লোড়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ঘটাচ্ছে তার দৈহিক ও নৈতিক অধঃপতন—এই সবগুলিই শুধু যাঁর চোখে পড়বে এবং যিনি শ্রমিককে হীন জীব বলে আঁকবেন তিনি আজ মিথ্যাবাদী, বুর্জোয়ার এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল। প্রগতিশীল সাহিত্যিক আজ এই খণ্ডিত বাস্তবকে সমগ্র বাস্তব বলে না দেখে তাঁর সাহিত্যে দেখাবেন কি ক'রে আজকের সংগ্রামের আগুনে শ্রমিকের জীবনের এই সব ক্লেদ পুড়ে যাচ্ছে, কি করে সংগ্রামী শ্রমিক এবং মেহনতী জনতা ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের শিবিরে সামিল হচ্ছে আর গ্রহণ করছে শ্রমিকশ্রেণী তার অগ্রণী ভূমিকা। সমাজবাদী বাস্তবতাকে জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ না করলে শ্রমিক জীবনের এই প্রকাশ এবং এই ভবিষ্যৎ দেখাবার ক্ষমতা সাহিত্যিকের আসবে

না; তিনি এখনও ক্ষয়িষ্ণু ধারাকেই (যেমন অচিন্ত্য, তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর) বর্ধিষ্ণু ব'লে দেখবেন এবং হতাশায় নিজেও ডুববেন (যেমন হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়), অপরকেও ডোবাবেন অথবা পুঁজিবাদের স্তবগান করবেন উপায়ান্তর না দেখে।

কিন্তু শ্রমিক, জীবনের তথা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে সামিল বহু মানুষের সত্যিকারের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না এলে এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী সৃষ্টিশীল মানুষ সাহিত্যভাত করার চেষ্টা যান্ত্রিক স্তবগানে পর্যবসিত হবে। বাস্তবের উপরেই কল্পনা গড়ে ওঠে এ কথা মার্কসিজমের গোড়ার কথা। সে কথা ভোলা মানে পঙ্গু সাহিত্য সৃষ্টি করে, এই সংগ্রামের মিথ্যা যান্ত্রিক চিত্র এঁকে, সংগ্রামী মানুষের সাহিত্যিকের উপর থেকে আস্থা নাশ করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে এই যুদ্ধকে অবাস্তব করে তোলা। আজকাল এই ভাবেই বুর্জোয়ারা নিজেদের সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে, যেখানে সেখানে "সর্বহারার" আমদানি করছে। সমাজবাদী বাস্তবতা শ্রমিক জীবনের এই মৌলিক সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা চিত্রিত করেন এবং সেই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকের এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের সমস্ত জীবনকে দেখান। তাই তিনি আদর্শবাদী, তাই তিনি রোমাণ্টিক। তিনি জীবনের ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন না, জীবনের গভীরে প্রবেশ করেন। তিনি শ্রমিকের প্রতি কৃপা করে "সহজিয়া" সাহিত্যের জলো রস পরিবেশন করে দায়িত্ব এড়াতে চাইবেন না। তিনি পার্টিজান লেখক হয়ে তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনাকে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর স্তরে উন্নীত করবেন, বিস্তৃত করবেন নিজের আঙ্গিকের প্রকাশ ক্ষমতা। আজকের দিনে তাঁকে বলতেই হবে—তিনি কোন পক্ষে—'On which side are you, masters of culture'? 'শ্রেণীসংগ্রামের চরম পর্যায়ে প্রগতি সাহিত্য মূলত সমাজবাদী চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের সাহিত্য' বলে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে বসে থাকলে তিনি শ্রেণী মিলনের ভাঁওতায় পড়বেন। এমন কি ক্রিটিকাল রিয়ালিজমের বুলিও তাঁকে বাঁচাতে পারবে না কেন না আজকের পাঠক আর ক্লেদের সমালোচনা চায় না, চায় ক্লেদ দূরীকরণের সংগ্রামী চিত্র।

—শ্রী শীতাংশু মৈত্র

চীনের সাহিত্যে ও শিল্পে সংযুক্ত ফ্রন্ট

—কুয়ো মো-জো

[চেয়ারম্যান, নিখিল চীন লেখক-শিল্পী সমিতি]

আজকালকার চীনা লেখকরা "৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে রচিত নূতন সাহিত্য এবং শিল্প" এই কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করেন। গত ত্রিশ বছরের সাহিত্য এবং শিল্প কোন দিক দিয়ে নূতন? প্রাচীনের প্রকৃতির সঙ্গে তার প্রকৃতির তফাৎটা ঠিক কতখানি?

বেশ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের লেখক ও শিল্পীরা এ সম্বন্ধে হয় অজ্ঞ ছিলেন কিংবা শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। প্রশ্নটির একটি খাঁটি বৈজ্ঞানিক সমাধান পাওয়া গেল কেবলমাত্র চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙএর "নূতন গণতন্ত্রের উপর" প্রকাশিত হবার পর। ঐ মহান রচনায় চেয়ারম্যান মাও দেখিয়েছেন যে, বর্তমান স্তরে চীনা বিপ্লব প্রকৃতিগতভাবে নূতন গণতন্ত্র। তিনি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষণগুলিকে, "সর্বহারার নেতৃত্বে জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লব" বলে চুম্বকের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করেছেন। চীনা বিপ্লবের পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি এইভাবে চীনের নূতন সংস্কৃতি, নূতন সাহিত্য ও শিল্পের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ভাষান্তরে, ৪ঠা মে আন্দোলনের পরেরকার নূতন সংস্কৃতি আর সেই পুরাতন গণতন্ত্রের অচল সংস্কৃতি নয়, তা নূতন গণতন্ত্রের নূতন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে; তা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী; তা' সর্বহারাশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন জনগণের সম্পত্তি; তেমনি, '৪ঠা মে আন্দোলনের পরে রচিত নূতন সাহিত্য এবং শিল্প' আর পুরাতন গণতন্ত্রের অচল সাহিত্য ও শিল্প নয়, তা নূতন গণতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী, নূতন সাহিত্য ও শিল্প—তা সর্বহারা নেতৃত্বাধীন জনগণের সাহিত্য ও শিল্পে পরিণত হয়েছে। '৪ঠা মে আন্দোলনের পরেরকার নূতন সাহিত্য ও শিল্পে'র মধ্যে 'নূতন' এটাই এবং পুরাতন সাহিত্য ও শিল্পের প্রকৃতি থেকে এইটেই তার তফাৎ।

বিগত শতাব্দিক বৎসরের চীনা সমাজের প্রকৃতির দ্বারা চীনা বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী কর্তব্য পূর্ব-নির্ধারিত হয়েছে।

আফিম্ যুদ্ধের সময় থেকে সমস্ত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পগত আন্দোলনই বিভিন্ন মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী হয়েছে। "সুতরাং চেয়ারম্যান মাও নূতন গণতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলির রূপরেখা দিয়েছেন তাদের মধ্যে, অর্থাৎ "সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী, জনগণের, সর্বহারা-নেতৃত্বাধীন" এই লক্ষণগুলির মধ্যে, শেষোক্তটি, "সর্বহারা-নেতৃত্বাধীন"ই সব চেয়ে মূলগত। সব চেয়ে বিপ্লবীশ্রেণী সর্বহারার নেতৃত্ব ছাড়া, অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক সর্বহারা দর্শন ছাড়া বিপ্লবের নির্ভুল নির্দেশ দেওয়া এবং নীতি নিরূপণ করা অসম্ভব। এইগুলি ছাড়া জনগণের শক্তির পূর্ণ বিকাশ অথবা চীনা বিপ্লবের জয়লাভ করা অসম্ভব হত।

শুধু রাজনৈতিক বিপ্লবে নয়, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পগত বিপ্লবেও এই কথা। চীনের ত্রিশ বছরের ইতিহাসে বার বার এই মূলগত সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পগত বিপ্লবগুলিতে আজ চীনারা যে মহান্ জয়লাভ করেছে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং মাও সে-তুং-এর শিক্ষা থেকে তাকে আলাদা করা যায় না। সর্বহারা নেতৃত্বের কারণেই, ৪ঠা মে আন্দোলনের পরবর্তী এই বিপ্লবগুলি চীনা ইতিহাসের অন্য যে কোনো বিপ্লবের চেয়ে অনেক দীর্ঘস্থায়ী, গভীর এবং আপসহীন হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারেই চীনা জনগণ নূতন গণতন্ত্রের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছে। সে কারণে, বিরাট জনতাকে কি ভাবে একটি বিস্তৃত ফ্রণ্টে সংগঠিত করা যায়, এই হল সর্বহারা নেতৃত্বের অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। এইরূপে একটি মিলিত ফ্রণ্ট ছাড়া, তাহার নির্ভুল পথ নির্দেশক নীতি ছাড়া, সমস্ত দেশের শক্তিকে সংহত করে শত্রুকে হারানো এবং চীনা বিপ্লবে জয়লাভ অসম্ভব। চীনের ত্রিশ বছরের ইতিহাসে বার বার এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ত্রিশ বছর ধরে নূতন সাহিত্য ও শিল্পের আন্দোলন সব সময়ই সংযুক্ত ফ্রণ্টের আন্দোলনই রয়ে গেছে। গোড়ার দিকে এই আন্দোলন ছিল, সাম্যবাদ সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান সবেমাত্র আয়ত্ত করেছেন এমন সব বুদ্ধিজীবী এবং পেটি-বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে। ৪ঠা মে আন্দোলন থেকে প্রথম মহান বিপ্লবের সময় পর্যন্ত তাঁরা অচল, সামন্ততান্ত্রিক এবং অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য ও শিল্পের রাজত্বকে চুরমার করেছিলেন এবং

তার জায়গায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বক্তব্যযুক্ত একটি নূতন সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাম্যবাদী ভাবাদর্শের প্রাথমিক ধারণাসম্পন্ন লেখকেরা এবং ক্রমশ সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এমন পেটি-বুর্জোয়া লেখকেরা এই আমলের প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্য সৃষ্টি করেন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁদের রচনার ব্যাপক প্রভাব ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযানে তার ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

চীনা বনিকদের দক্ষিণপন্থী অংশের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম মহান্ বিপ্লবের পরাজয়ের পর চীনা বিপ্লবের একটি নূতন যুগ আরম্ভ হল। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বামপন্থী আন্দোলন জন্মলাভ করল। এই আন্দোলন সর্বহারা ও বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত ফ্রণ্টের আন্দোলন। লুহ্ সুনকে পতাকাবাহী করে এই আন্দোলন বার বার সাহসের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং কুওমিনটাং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়েছিল। এ যে কেবল বহু পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রকে স্বপক্ষে টেনেছিল তাই নয়, সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রের বহুসংখ্যক ক্যাডারকে অনুপ্রাণিত এবং শিক্ষিতও করেছিল। মোটের উপর, চীনা বিপ্লবে এর দান ছিল অসামান্য। এই আন্দোলনের আমলে কয়েকটি মাত্র সাহিত্যিক ও শিল্পীই সংকীর্ণমনা 'রুদ্ধদ্বার'-নীতিমূলক ভুল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন।

তারপর জাপ আক্রমণ বিরোধী যুদ্ধের প্রাক্কালে, জাপ আক্রমণ বিরোধী সাধারণ উদ্দেশ্যে, চীনা সাহিত্যিক ও শিল্পীগোষ্ঠীগুলি সর্বহারা, পেটি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়া এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক লেখক ও শিল্পীদের নিয়ে গঠিত একটি ব্যাপকতর যুক্ত ফ্রণ্টে সর্বহারা নেতৃত্বে সংগঠিত হল। যুক্ত ফ্রণ্টের ভিতরে কিছু কিছু লেখক এবং শিল্পী, কোন কোন পর্যায়ে ভাবাদর্শগত সংগ্রাম এবং গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সমালোচনায় অবহেলা করেন। তার ফলে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিও ঘটে। তবুও মোটামুটিভাবে দেখলে, যুদ্ধকালীন নূতন গণতান্ত্রিক সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলন প্রগতি এবং বিকাশ লাভ করে এবং প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রভূত সাহায্য করে।

গত দু' তিন বছরে, আন্দোলনের প্রধান ধারাগুলিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ এবং প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে। কুওমিন্টাং শাসিত অঞ্চলে সাহিত্য ও শিল্পের সশস্ত্র সৈন্যদলগুলি যে কেবল শেষ পর্যন্তও পিছু হটে নি তা নয়, অত্যাচরিত লেখক ও শিল্পীরাও দৃঢ়ভাবে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন

গভীর রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বহু রচনার সৃষ্টি করেছেন, কুওমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ করেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে মাও সে-তুং-এর নূতন নির্দেশের প্রভাবে লেখক ও শিল্পীরা জনতার সঙ্গে মিশে যাবারও চেষ্টা করেছেন। মুক্ত অঞ্চলে বাস্তব অবস্থা মূলগতভাবে আলাদা। সেখানে মাও সে-তুং-এর শিক্ষা সরাসরিভাবেই পাওয়া যেত এবং শিখে নিয়ে কাজ করতে পারেন এমন বহু লেখক ও শিল্পী সেখানে ছিলেন। কাজেই, ৪ঠা মে আন্দোলনের সময় থেকে যে সমস্ত ভাবাদর্শগত এবং প্রয়োগমূলক সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় ছিল, ১৯৪২ সালে ইয়েনানে লেখক ও শিল্পীদের আলোচনার পর সেগুলির সমাধান হয়। তারপর থেকে সাহিত্য ও শিল্পের স্রষ্টারা ব্যাপক জনতার সঙ্গে মিশে যান এবং শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের সেবা করতে থাকেন। তখন সাহিত্য ও শিল্পে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। গত ত্রিশ বছরে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্টের মূল অবস্থাগুলিকে ঐ সমস্ত ঘটনা রূপ দিয়েছে। গত ত্রিশ বছরে সাহিত্য ও শিল্পের যুক্তফ্রণ্ট যে সব কীর্তি ও বিজয়লাভ করেছে ঐগুলি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণীও বটে।

গত ত্রিশ বছরে, জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সামন্ততন্ত্রবাদী সাহিত্য ও শিল্পকে সমস্ত দেশের লেখক, শিল্পী ও জনগণ বর্জন করেছেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী, কুওমিন্টাংএর ফাশিস্ট সাহিত্য ও শিল্পকে সব সময়ই তাঁরা বিদ্রূপ করেছেন। এগুলি ছাড়া চীনা সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের মহলে গত ত্রিশবছরকার প্রধান বিসম্বাদ হল দু'টি ভাবধারাকে নিয়ে; একটি হল দুর্বল উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী 'শিল্পের জন্যই শিল্প', এই ভাবধারা এবং অন্যটি হ'ল সর্বহারা শ্রেণী এবং অন্যান্য সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী, 'জনগণের জন্যই শিল্প' এই ভাবধারা। গত ত্রিশ বছর ধরে এই দুই ভাবধারার মধ্যে সংঘর্ষের ফলে, ইওরোপ ও আমেরিকার ধনবাদী দেশের মুমূর্ষু সাহিত্য ও শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত, "শিল্পের জন্যই শিল্পে"র তত্ত্বটি সম্পূর্ণ দেউলে হ'য়ে গেছে। ঐ তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট রচনার শ্রোতা নেই এবং যে সব লেখক এবং শিল্পী একদা ঐ তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তাঁরা ক্রমশ জীবন এবং শিল্প সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছেন এবং সর্বহারা মতাদর্শের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। অপর পক্ষে এই নেতৃত্বের অধীন এবং জনগণের সেবা তৎপর সাহিত্য ও শিল্প দিনে দিনে বিপুলায়তন হ'য়ে

উঠেছে, তার গতি উত্তরোত্তর নির্দিষ্টতা লাভ করেছে, এবং ব্যাপক জনসাধারণের কাছ থেকে তা অধিকতর সাদর আহ্বান এবং সমর্থন পেয়েছে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায় যে, জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে না পারার ফলে চীনা বুর্জোয়া শ্রেণী সাহিত্য ও শিল্পের নেতৃত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উন্মুখ থেকেও শোচনীয়ভাবে অকৃতকার্য হয়েছে। আর বোঝা যায় যে সর্বহারা নেতৃত্ব অস্বীকার করে কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী কিছুই করে উঠতে পারবেন না। এইটাই গত ত্রিশ বৎসরকার চীনা সাহিত্যিক ও শিল্পগত আন্দোলনের নূতন গণতান্ত্রিক চরিত্রের সুগভীর প্রমাণ।

চীনা সাহিত্য এবং শিল্পের গত ত্রিশ বছরের ইতিহাস থেকে এই যে একটি শিক্ষালাভ হয়, প্রত্যেক গভীরদর্শী লেখক ও শিল্পী তার প্রতি মনোযোগ দিলে ভালই করবেন। এখন, যাঁরা অতীতে বিপ্লবে জড়িত হন নি এমন সকল লোককেই চীনা বিপ্লবের মহান্ বিজয় বিচলিত করেছে। সুতরাং অতীতের চেয়েও ব্যাপকতর যুক্তফ্রণ্টের সম্ভাবনা সাহিত্য ও শিল্পে দেখা দিয়েছে। চীনা জনগণের রাজনৈতিক আলোচনা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভার বক্তৃতায় চেয়ারম্যান মাও সে-তুং বলেন, "চীনা বিপ্লব হল সারা জাতির জনগণের বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততন্ত্রী, আমলাতান্ত্রিক ধনিক, কুওমিনটাং প্রতিক্রিয়া চক্র এবং তার সহায়কেরা ছাড়া সকলেই আমাদের বন্ধু। আমাদের একটি ব্যাপক এবং সংহত যুক্তফ্রণ্ট রয়েছে। আমাদের ফ্রণ্ট এত বিস্তৃত যে এতে মেহনতী শ্রেণী, কৃষক, পেটি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়ারাও আছেন।"

সাহিত্য ও শিল্পের যুক্তফ্রণ্টে ঐ কথাই খাটে। চেয়ারম্যান মাও-নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে লেখক ও শিল্পীরা প্রথমত রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হবেন। রাজনৈতিক ফ্রণ্টের মত সাহিত্য ও শিল্পের যুক্তফ্রণ্টেও স্বভাবতই যেমন বিভিন্ন শ্রেণী আছে তেমনই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীও থাকবে। কোনক্রমেই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সহ্য সহ্য বিলোপ করা যাবে না ; তা সহ্য করতেই হবে। প্রথমেই রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের লেখক ও শিল্পীদের জনসেবার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করতে হবে। লেখক এবং শিল্পী মহলে সমালোচনা এবং আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে এবং তাঁদের নিজের চেষ্টার মধ্য দিয়ে জনগণের কাজে লাগবার এই সাধারণ লক্ষ্যে পৌছাতে হবে।

যেমন রাজনীতিতে, তেমনি লেখক ও শিল্পী মহলেও যুক্তফ্রণ্ট কেবল ঐক্যের মধ্য দিয়েই সংহত হবে না, সমালোচনাও নিশ্চয়ই থাকবে। লেখক ও শিল্পী মহলে দরকার স্বাস্থ্যকর, গণতান্ত্রিক মনোভাবের। আর সবাইকে সমালোচনা করা যাবে অথচ নিজেকে সমালোচনা করবার অনুমতি তাদের দেওয়া হবে না, এইরকম ক্ষতিকর মনোভাব কর্তৃত্ব-প্রিয়তার লক্ষণ ; লেখক ও শিল্পীরা এই মনোভাবকে ঘৃণা করবেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অধ্যবসায়শীল-এবং নির্ভুল নেতৃত্বের অধীনে চীনা জনগণ দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ঠুর সশস্ত্র এবং অন্যবিধ সংঘর্ষের অভিজ্ঞতার পর অবশেষে জাতি-ব্যাপী বিজয় লাভ করেছে। কুওমিনটাং প্রতিক্রীয়াশীলদের অবশিষ্ট অংশকে খুঁজে বের করে আটক করা হচ্ছে, এবং চীনা বিপ্লব এমন একটি নূতন ঐতিহাসিক যুগে পা দিচ্ছে যখন রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, এবং দেশ রক্ষার বিস্তৃত পরিমাপের গঠনমূলক কাজ চলবে। নূতন যুগের লেখক এবং শিল্পী হিসেবে আমাদের কর্তব্যের কথা বার বার আলোচনা করে দেখবার এই হলো সময়। এমন বিস্তৃত একটা যুক্ত ফ্রণ্ট সামনে থাকায় আমাদের সমস্যা হলো, এখন থেকেই কি ভাবে মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১) আমাদের ঐক্যকে শক্তিশালী করে সমস্ত জাতির জনগণের সঙ্গে আমরা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরাজয়ের জন্য এবং চীনের জনগণের নূতন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের গঠনের জন্য সংগ্রাম করব! আমাদের সাহিত্যিক এবং শিল্পগত হাতিয়ার দিয়ে আমরা সংগ্রাম এবং গঠন উভয় কাজকেই তীব্র করে তুলব।

২) আমরা বাস্তবের গভীরে ডুব দেব, জনগণের মেহনত, বুদ্ধি কৌশল এবং সাহসকে ব্যক্ত করব এবং তার প্রশংসা করব। চিন্তা এবং নৈতিকতায় সমৃদ্ধ এমন সাহিত্য এবং শিল্প গড়ে তুলব আমরা জনগণের জন্য, যা তারা গভীর আগ্রহে পড়বে, দেখবে, শুনবে, যার মধ্য দিয়ে, আমাদের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলবার মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কলকারখানায়, গ্রামাঞ্চলে এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জনগণের সাহিত্যিক ও শিল্পগত কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য রাখব, যাতে করে জনগণের মধ্য থেকে নতুন নতুন লেখক ও শিল্পীকে দলে ভর্তি করতে পারি।

৩) আমাদের মধ্যে অচল, অর্ধ-সাম্রাজ্যবাদী এবং অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক

সাহিত্য ও শিল্পের যে অবশেষ রয়ে গেছে, আমরা তার মূলোচ্ছেদন করব। সাহিত্য ও শিল্পের উপর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির এবং যা আমাদের এখানে এখন রয়ে গেছে সেই চীনা সামন্তবাদের প্রভাবের বিরোধিতা করব। আমাদের সাহিত্যিক এবং শিল্পগত উত্তরাধিকারকে আমরা বিচার করে গ্রহণ করব, সমস্ত সুন্দর এবং প্রগতিশীল ঐতিহ্যকে বাড়িয়ে তুলবো, সোভিয়েট সোশালিস্ট যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে যতদূর সম্ভব আত্মসাৎ করব এবং আন্তরিকতার সঙ্গে দেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিকতার অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধকে বিকশিত করে তুলবো।

আমরা দেখেছি যে, চীনের সাহিত্যিক এবং শিল্পগত আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখবার মূল্যবান ঐতিহ্য বহন করেছে। ৪ঠা মে আন্দোলনের পর থেকে প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগে চীনা সাহিত্যিক ও শিল্পগত আন্দোলনের প্রধান ধারাটি অনিবার্য ভাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিপ্লবী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী দল হিসাবে কাজ করেছে। বুদ্ধি-কৌশলী এবং সাহসী চীনা জনগণের সঙ্গে বহু লেখক এবং শিল্পী তাঁদের রক্ত দিয়েছেন, জীবন দিয়েছেন। কৃষি বিপ্লবের যুগে কুওমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলেরা বহু লেখক এবং শিল্পীকে হত্যা করেছে। জাপবিরোধী যুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধে আরও বেশী লেখক এবং শিল্পী যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, কারাকক্ষে এবং জমিদার ও গুপ্ত পুলিসের হাতে নিহত হয়েছেন। আমরা তাঁদের আত্মবলিদানের ভাবটি গ্রহণ করব এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, আমলাতান্ত্রিক ধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দেব, নূতন চীনের গঠন কার্যে যোগ দেবো।

যে হেতু আমাদের ক্ষেত্র হল সাহিত্য এবং শিল্প, আমরা সংগ্রাম এবং গঠনের কাজে শুধু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েই যোগ দেব না, আমাদের সাহিত্য এবং শিল্প সৃষ্টির মারফতেও যোগ দেব। ত্রিশ বছর ধরে চীনের নূতন সাহিত্য ও শিল্পের আন্দোলন যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, প্রগতিশীল জনগণের উপর যে প্রভাব সে বিস্তার করেছে, চীনা বিপ্লবে তার যা দান, সে দিক থেকে দেখলে, তা নিঃসন্দেহেই চরম বিজয় লাভ করেছে। তবুও, চীনা জনগণের মহান সংগ্রাম এবং সৃষ্টিশীলতার তুলনায়, এবং জনগণ আমাদের লেখক ও শিল্পীদের কাছ থেকে যে প্রত্যাশা করে তার পরিমাণে আমাদের কৃতিত্ব আদৌ যথেষ্ট নয়। জনগণের সংগ্রাম এবং সৃষ্টিশীলতাকে

ব্যক্ত করবার জন্য, তাদের চাহিদা মেটানর জন্য লেখক ও শিল্পীদের বাস্তবের আরও গভীরে ডুব দিতে হবে, পর্যবেক্ষণ বাড়াতে হবে। জনগণই চিরদিন সাহিত্য ও শিল্পের প্রবহমান উৎস। জনগণকে প্রতিফলিত করতে হলে, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকার দরকার। প্রথমে আমরা তাদের ছাত্র হব, যাতে পরে আমরা তাদের শিক্ষক হতে পারি। প্রত্যেক সৃষ্টিকুশল লেখক এবং শিল্পীর প্রাথমিক কর্তব্য হলো বাস্তবের গভীরে ডুব দেওয়া। কিন্তু বাস্তবের গভীরে ডুব দিলেই তাকে পুরোপুরি জানা যায় না। আজকের চীনা সমাজে প্রচণ্ড এবং সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটছে। অতীতে আমাদের লেখক এবং শিল্পীরা যে বাস্তবের সম্মুখীন ছিলেন, আজকের বাস্তব তার চেয়ে অনেক জটিল। অপর পক্ষে, আমাদের পাঠক এবং শ্রোতাদের প্রতি আগের চেয়েও অনেক বেশী দায়িত্বশীল এবং গম্ভীর মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং আমাদের বিপ্লবী তত্ত্ব এবং নীতি এবং সাহিত্য এবং শিল্পের প্রগতিশীল তত্ত্ব ভাল করে জানতেই হবে। কেবল এ গুলি ভালো করে জানার মধ্য দিয়েই আমরা বাস্তবকে সঠিক বুঝতে পারব, এবং আমাদের রচনার মতাদর্শগত স্তরকে উন্নীত করতে পারব। আমাদের শিল্পের গুণ এবং আঙ্গিক উন্নত করতে হবে, যদিও এই উন্নতি হবে নির্ভুল পরিচালনার অধীনে, এবং জনপ্রিয়তার অভিমুখেই। শিল্পের গুণগত এবং আঙ্গিকগত উন্নতিসাধনে আমরা চীন এবং অন্যান্য দেশের সাহিত্য ও শিল্পের ঐতিহ্যকে বিচার করে গ্রহণ করব। সঙ্গে সঙ্গে, জনগণ যা সহজে নিতে পারে এবং যা সব চেয়ে ভাল ভাবে তাদের ফুটিয়ে তোলে তাই আমরা আত্মসাৎ করব। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না এমন সমস্ত কিছুই আমরা বর্জন করব। আমাদের দেশী বিদেশী কোন সাহিত্য ও শিল্পগত ঐতিহ্যকে আমরা অন্ধ ভাবে ত্যাগ করবো না, অন্ধভাবে তার উপাসনা বা অনুকরণও করব না।

এ ছাড়া, আর একটা গুরুতর ব্যাপারের দিকে আমাদের নজর এড়িয়ে গেলে চলবে না; যথা, অচল, অর্ধ-ঔপনিবেশিক, অর্ধ-সামন্ত-তান্ত্রিক এবং সামন্ততান্ত্রিক সাহিত্য এবং শিল্প, যা আমাদের মধ্যে কার্যত অক্ষতভাবেই রয়ে গেছে। জনগণের পিছিয়ে থাকা অংশের উপর এখনও তার প্রভাব আছে। আমরা প্রতিক্রিয়ার ফ্রণ্টে ঢুকে তাদের কাছ থেকে তাদের ক্ষেত্রকে ছিনিয়ে নেব। নানা উপায়ে

এটা করা যাবে। একটা কার্যকরী উপায় আমরা মুক্ত এলাকায় দেখেছি; তা হচ্ছে অচল ধরনের সাহিত্য ও শিল্পকে এবং তার রচয়িতাদের সংশোধন করবার জন্ম লেখক ও শিল্পীদের গ্রামাঞ্চলে যাওয়া। একথাও আমাদের অস্বীকার করা ঠিক হবে না যে, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া দেশগুলির এবং চীনা সামন্ততন্ত্রের সাহিত্য ও শিল্পের প্রভাব এখনও রয়েছে। সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার দ্বারা সেগুলির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আমাদের নূতন সাহিত্য এবং শিল্পের আন্দোলন থেকে এইসব পশ্চাৎপদ প্রভাবকে ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হবে। কারখানায়, গ্রামাঞ্চলে এবং সৈন্তবাহিনীতে জনগণের সাহিত্যিক এবং শিল্পগত কাজকর্মকে বিকশিত করে তোলবার দিকেও আমাদের গভীর মনযোগ দিতে হবে। আমাদের সাহিত্য ও শিল্পের বলিষ্ঠ বিকাশের জন্য, জনগণের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য এবং তাদের সেবার জন্যই আমাদের এইসব কাজ করতে হবে।

"৪ঠা মে আন্দোলনের পরেরকার নূতন সাহিত্য এবং শিল্পে"র প্রধান খুঁত হল এই যে, তা জনগণের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে নি। অতীতে যখনই আমরা কোন ভুল করেছি, দোষ দিয়েছি বাস্তব অবস্থার। আজ সবই আমাদের হাতে, কেবল পূবে হাওয়ার ঝুঁটি ছাড়া। ঐ পূবে হাওয়ার ঝুঁটি আমাদের নিজেদেরই চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের মহান জাতির যোগ্য সাহিত্য ও শিল্প আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। বিরাট চীনা জনগণের চাহিদা আমাদের মেটাতে হবে।

বিশাল আমাদের কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু পথ আমরা নির্ধারিত করেছি। বহু গুরুত্বপূর্ণ এবং সফলতার অভিজ্ঞতা আমাদের সহায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সমস্ত সম্ভাব্য পথই মাড়াতে হবে জনগণের সঙ্গে মিশবার জন্য। এ হবে আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সচেতন আন্দোলন। যাঁরা কোন না কোন উপায়ে ইতিমধ্যেই জনগণের সঙ্গে মিশতে পেরেছেন, চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর বহুবার উচ্চারিত সতর্কবাণী তাঁদের মনে রাখা দরকার: "অহঙ্কৃত হয়ো না, আত্মসন্তুষ্ট হয়ো না।" যে সব লেখক এখনও জনগণের সঙ্গে এই ঐক্য স্থাপন করতে পারেন নি,

তার জন্য তাঁদের পর্যাপ্ত জ্ঞান এবং দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে,—তারা যেন ভয় না পান। বিনয় এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে ভাল জান্নন শুন্নন; আমাদের নেতৃত্বের সহায়তায়, আমাদের বিশ্বাস, এই যুগের লেখক ও শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহাসিক কর্তব্য সুসম্পন্ন করতে পারবেন। যে সাহিত্য এবং শিল্প আমরা রচনা করব, জনগণ তা সাগ্রহে গ্রহণ করবে এবং তাদের শিক্ষার দিক থেকে তা মূল্যবান হয়ে উঠবে। *

* ১লা জানুয়ারী ১৯৫০-এর 'পিপলস চায়না'য় প্রকাশিত

এই দাঙ্গা

দাঙ্গা ?
প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের স্তম্ভিত শিরোনামায়
অতি কথনের লেফাফা আটা রক্ত-বমন ;
ক্লেদাক্ত মননের মর্মান্তিক বিষোদ্গার
বজ্জাতী করা কলমের ভাষায়।
চম্‌কে তাকাই—
বারবণিতার চটুল চোখে হাসির ঝিলিক্
৫০ বছরের ফোকলা মুখে কথার খৈ।
তুবড়ি ছোটানো খবর,
প্রতিটি অক্ষরে জাগর-রাত্রির সর্বনাশা অশ্লীল ইঙ্গিত।
: চিতল মারী কাবার, নিঃশেষ কালশিরা
: হিন্দু-সংস্কৃতি উজাড়, উজাড় গাঁয়ের বুক, নারীর মান
নদী-মেখলার সবুজ দেশ পাকিস্তানের জবর সংবাদ :
অতএব ধীমান—সাবধান, তলোয়ার তোলো
প্রস্তুত হও আসমুদ্র হিমাচল হিন্দুস্থান ॥

দাঙ্গা ?
মুসলিম নারীর রক্ত-গঙ্গায় টল্‌মল্ কোলকাতা
অপবিত্র মসজিদ, স্তব্ধ আজান !
ঢাকাই মসলিনের মত সূক্ষ্ম কারুকার্যময়
হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংবাদপত্রের পিচ্-পোড়া দাঁতের ফাঁকে
এক টুক্‌রো বাঁকা হাসির সাথে বেশ্যাবৃত্তির চরম অবদান :
অতএব নওজোয়ান—সাবধান, কবুল করো জান
কাফেরের রক্ত-রঙে হোলি খেলা চাই—
প্রস্তুত হও শাহানশাহী পাকিস্তান ॥

শির্ শির্ করা একটা উত্তেজনায় প্রস্তুতি চলে,
দ্বিখণ্ডিত বাংলার মেঘ—থম্ থমে আকাশে ঝড়ের আশঙ্কা :

দুই বাংলার শ্যামল মাঠে
নিরন্ন চাষীর বাঁচার লড়াই খতম্ করার নির্মম ষড়যন্ত্র।
জংগী শ্রমিকের বে-পরোয়া হাত,
যখন শোষণের শৃংখলটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়
সর্বাঙ্গে যখন তার বিস্ফোরণের তীব্র জ্বালা
ঠিক সেই মুহূর্তে এই দাঙ্গার আগুন।
সূর্যের আলোর মত অত্যন্ত স্পষ্ট এই ষড়যন্ত্র :
মানুষের মহৎ ভবিষ্যতকে টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে ভেঙে ফেলে
বাঁচবার শেষ চেষ্টায় ঘৃণ্য দস্যুদলের এই মরণ কামড়।
ইতিহাস থমকে উঠে।
দম্‌কা হাওয়ায় ফুর্ ফুর্ কোরে কয়েকটা পাতা উল্টে যায় :
চেক্‌জাতির কথা, রাশিয়ার জার, ডলার দেশের মার্কিন প্রভু
অধুনা আফ্রিকার শ্বেত হস্তী
আমার দেশের সেদিনের কলঙ্কময় ছে' চল্লিশ সাল
স্পষ্ট, অত্যন্ত স্পষ্ট, জলের মত স্বচ্ছ-পরিষ্কার।
দাঙ্গা লাগিয়ে ওরা বাঁচতে চায়,
বাঁচতে চায় স্বদেশী-বিদেশী বেইমান, দস্যু-দালাল।
ধূসর পাহাড়ের কোলে দিগন্ত প্লাবিত মাঠে
প্রদীপ্ত হাজং চাষীর বহ্নি-মান ক্রোধ থেকে ওরা বাঁচতে চায়
বাঁচতে চায় বেয়োনেটের ডগায়
অহল্যার শিশু-ভ্রূণকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা কোরে
বাঁচতে চায় গরম কথায় সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত কোরে
দাঙ্গার বিষ-বাষ্পে মুছে ফেলে মুক্তির আকাশ ;
ওরা বাঁচতে চায়—
তাই হিংস্র পাশবিকতায় ষড়যন্ত্র পাকায়।

তবু অগণিত মানুষ, ক্ষিপ্ত সচকিত খেটে-খাওয়া মানুষ
উজ্বল আলোর ডাকে সাড়া দেয়,
খদ্দর পরা হন্যে কুকুর পোষা সেবাদলের মুখে থুথু ছুঁড়ে
রুখে ওঠে : এ দাঙ্গা রুখব।

রুখে ওঠে মেঘনা-পদ্মার স্রোতমান দুর্জয় বিদ্রোহ নিয়ে
ধানী-বাংলার হিন্দু-মুসলিম খেতমজুর।
আনসারী কুত্তার টুটি চেপে ফেটে-পড়া সশব্দ হুঙ্কার,
দুরন্ত পদধ্বনি : এ দাঙ্গা রুখব।
দুই বাংলার থম্‌থমে কালো আকাশে
লাল অগ্নিশিখার ঘনায়মান কী আশ্চর্য বিস্ফোরণ !
জ্বলন্ত বয়লার থেকে উত্তপ্ত ফুলঝুরি
ছড়িয়ে যায় মাঠে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে।
তারপর জ্বল্ জ্বল্ কোরে জ্বলে ওঠে একটা সংকেত :
অন্ধকার রাত্রির আকাশে একটি লাল তারা।

এ বিদ্রোহ আমার :
বিদ্রোহ আজ শয়তানী চক্রজালের নির্মম পেষণ থেকে
মাটি চাওয়া, রুটি চাওয়া সবহারা
সাচ্চা-জংগী মানুষদের ছিনিয়ে আনার।
দাঙ্গাকে প্রতিরোধ কোরে তাই এগিয়ে যাই,
এগিয়ে যাই মুক্তি মিছিলে শান্তির অভিযানে
জীবনের মুকুলিত আশার জয়গানে—
পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, ঢাকা, বরিশাল,
গোটা দেশের প্রতিটি ফলন্ত ফসলের ক্ষেতে
পটারী চটকল এলাকা ছেড়ে আরও দূরে
বস্তি-ব্যারাকে ঘূর্ণী কেটে উধাও ঝড়ে।

আমি মানুষ, মহৎ ভবিষ্যতের অধিকারী আমি,
আমি সৈনিক :
গণ-গঙ্গার উত্তাল জোয়ারকে এগিয়ে দিতে
আতংকিত প্রহরের ভীড় ঠেলে
ছাটাই করার ষড়যন্ত্রে সৃষ্ট এ দাঙ্গার বিরুদ্ধে
আজ সবল হাতে রুখে দাঁড়াই
আমি চাষী-মজুরের ঝাণ্ডা উড়াই।

—ধনঞ্জয় দাশ

জেগে আছি

অনেক যুদ্ধের শেষে আবার যুদ্ধের কানাকানি
যত শুনি
তত উঠি ক্ষেপে।
দৈনিক কাগজ খুলি, চোখ মেলি প্রথম পাতায়—···
রক্তের হ্রেষায়
ওই কারা নখর শানায় ?
শিকারী শকুন আর আদিম আরণ্যহিংস্র হায়েনার দল
ফেলে রোজ বিশ্ববেড়া জাল,
জলোস্থল নভোস্থল ব্যেপে...।
আকাশ-চুম্বিত-সৌধে চোরাগুপ্তি এটমযুদ্ধের—
ক্রুদ্ধ জয়োধ্বনি।
আর,—সাম্রাজ্যের অন্তিম প্রহরে
অনেক করুণ সুরে বেড়ালে-ইঁদুরে-শেয়ালে-কুকুরে
ঐক্যতান······
যপে নাম যিশু ও বুদ্ধের।
ডামাডোল, "যিশু বোল", "গান্ধী বোল"···
বকধর্মী শান্তির-বচন···।
তারই সঙ্গে ওপারের অতলান্ত-সমুদ্রতরঙ্গে ভেসে আসে—
এপারের শালবীথি, আম্রকুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ শান্তির ভাষণ।
কূজনে গুঞ্জনে কালোদের কানে কানে শ্বেতকায় সাধুদের(?) কুমন্ত্রণা
ডলারী দালালীপুষ্ট শ্বেতকুষ্ঠ—গোলামীর শকুনী প্রেরণা।
বারে বারে পৃথিবীরে উলঙ্গ বঞ্চনা—।
আর না।
এই সব কুষ্ঠদের দান
(যাদের ধর্মের বাপ এটলি-ট্রুম্যান)
উদ্ধত তলোয়ারের শাণিত চাবুকে প্রত্যাখ্যান !

* * *

কেন ? আবার জিজ্ঞেস করছ ?
সোনার হাঁসুলীপরা সুনীল আকাশটাকে দেখছ ?
দেখছ, রাতের আকাশভরা নীলাঞ্জন তারা—

মর্তের আবাস আলো করা,
শিশুদের টুকটুকে ঠোঁট, আর প্রিয়তমার টুকটুকে হাসি—
প্রেমিক-প্রেমিকা আত্মহারা, আবেগ বিহ্বল।
নীলাচঞ্চল রাশি রাশি ঐ রূপালি আলো।
বলতে পার? কাদের বিষের শ্বাসে···
বারে বারে পুড়ে পুড়ে, অঙ্গারে অঙ্গারে
ঐ আকাশ, ঐ আলো সুষমা হারাল?
শিশুপ্রাণা ধরণীরে কোথাকার যিশুরা পোড়ালো?
নির্বিকারে বুদ্ধেরা মাড়ালো—
কুমারী প্রাচী'রে···কোন অহঙ্কারে?
প্রেয়সীর হাসি, ···উদ্দাম উচ্ছল···
কার বিষে নীলান্তক কালকুট যুগান্তের বাণী?
কেন তার লজ্জাহত নীরব ক্রন্দন···?
কোন পাপাচারী কেড়ে নিল বিচঞ্চল অঙ্গের বসন?

আজ তাই আর এক যুদ্ধের প্রস্তুতি···
ঘরে ঘরে শিবির বিভাগ···।
মরচে পড়া হাতিয়ার শাণিয়ে নিয়েছি···
মুক্তির শিবিরে জেগে আছি, অতন্দ্র পাহারা
শান্তির শিবির গড়া···পণ···
(হুশিয়ার যুদ্ধবাদী নর-দুঃশাসন !)
আমাদের উদ্দাম প্রস্তুতি···
দস্যুতার মোক্ষম জবাব!
তাই, নির্বাক প্রিয়ারও চোখে বজ্রের উত্তাপ;—
সে উত্তাপ অণুতে অণুতে ভরে—
খাপে ঢাকা তলোয়ার কোষমুক্ত করে;—
যেন আমরই চুম্বন—
প্রেয়সী নিয়েছে তুলে নির্ভয় অন্তরে।
আমাদের মতো আরো কত কত···
শ', হাজার, লক্ষ, কোটি দুজন,
বুকে বুকে আশার তুফান···

দুলছে···। ক্ষুধিত পৃথিবী
হে অহল্যা সাহারা,
তোমার রক্তের তৃষা—উন্মুক্ত কৃপাণ সিক্তিত খুনে
এবারে, সীমাহারা—অগস্ত গণ্ডুষে
কানায় কানায় মিটিয়ে নেবে, বৈরী-রক্তে উদ্দীপ্ত জীবনে—
তারপর···সাফল্যময় ক্রান্তি!
ঘোর যুদ্ধ শেষে আমাদের অর্ঘ্য দেবে, দেবে উপহার,
বৈষম্যহীন ক্ষিতি···বঞ্চনাহীন
বিরাম নেবার মতো ঘর।
ঘরভরা রক্তকণা ধান···
গৌর-কান্তি শিশুদের কল কল গান···
আর, এটম বোমার আতঙ্কশূন্য শান্তি।

—বন্দনা দাশগুপ্ত

নতুন শাসনতন্ত্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতি

২৬শে জানুয়ারীর পর ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, সাম্রাজ্যবাদ এদেশের কায়েমীস্বার্থবাদ এবং তাদের কংগ্রেসী আর সমাজতন্ত্রী দালালরা ছাড়া দেশের সাধারণ মানুষ এর বিরোধী। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, মেহনতী মানুষ বিভিন্ন উপায়ে এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দিয়েছে। নানা দিক থেকে এই শাসনতন্ত্রের সমালোচনা হয়েছে। দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপর এই শাসনতন্ত্রের ফল কি হবে সে সম্পর্কে একটি আলোচনা উত্থাপন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ধনিক শ্রেণীর মাইনে করা প্রচারক বা সেই প্রচারে নিতান্ত অন্ধ নন এমন যে কোন লোক ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রটির বিভিন্ন ধারার উপর একবার চোখ দিলেই দেখতে পাবেন যে, এ শাসনতন্ত্র যে শুধু দেশের পরাধীনতাকে আরও দৃঢ় করেছে, শ্রমিককে কাজ এবং বাঁচার মত মজুরি দিতে, কৃষককে জমি দিতে অস্বীকার করেছে, রাষ্ট্রতন্ত্রকে সাম্রাজ্যবাদ এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করেছে তাই নয়—ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য এরকম হওয়াই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী কেন না রাষ্ট্রের শ্রেণী-রূপের সঙ্গে সংস্কৃতি এবং শিক্ষার প্রতি তার মনোভাবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে অন্যান্য সব জিনিসের মতই সংস্কৃতি এবং শিক্ষাও শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার। রাষ্ট্রক্ষমতা যে-শ্রেণীর হাতে সে রাষ্ট্র-তন্ত্রের মারফত সংস্কৃতি এবং শিক্ষাকে ব্যবহার করে তার শ্রেণী-শাসন, শ্রেণী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সুদৃঢ় করার জন্য।

যে ভাবে, যতখানি শাসক শ্রেণীর স্বার্থে যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার প্রয়োজন থাকে তখনই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের রাষ্ট্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার এবং বিকাশকে তখন ঠিক ততখানি পরিমাণে এবং সেইভাবে সাহায্য করে। ধনিক শ্রেণীর উঠতি যুগে সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল—সেই

প্রয়োজনের তাগিদে ধনিকশ্রেণী মধ্যযুগের সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নতুন বুর্জোয়া সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল, মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন, সমৃদ্ধতর পর্যায় সৃষ্টি করেছিল। বুর্জোয়া যন্ত্র উৎপাদনের বিকাশের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল মোটামুটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান শ্রমিকের তাই গণ-শিক্ষার (অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা) বিস্তার ধনিক রাষ্ট্রের কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছিল। আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের সুপরিচিত ইতিহাসও এই সত্যকেই প্রমাণ করে। বৃটিশের রাষ্ট্রযন্ত্র চালাবার জন্য 'শিক্ষিত' কেরানি কর্মচারীর প্রয়োজনের সঙ্গে এদেশের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস একান্তভাবে জড়িত।

ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়ায় ধনিক শ্রেণীর উঠতির যুগ শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে তার সাধারণ সংকটের যুগ, মরণের যুগ। এ যুগে তার রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনসাধারণের হাত থেকে বাঁচানই শাসক শ্রেণীর প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে রাষ্ট্র চালাতে হচ্ছে জন-সাধারণের বিরুদ্ধে। শিক্ষাবিস্তার আর সংস্কৃতির বিস্তার শোষিত জন-সাধারণকে শক্তিশালী করে। তাই ধনিক শ্রেণী আর তার রাষ্ট্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরদিকে সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন আর দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের গণরাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী শ্রমিকশ্রেণী আর তার সহযোগীরা বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করে শ্রমিকশ্রেণী আর শোষিত জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতাকে দৃঢ়তর করার প্রয়োজনেই ব্যাপকতম শিক্ষা বিস্তার আর সংস্কৃতির বিকাশের জন্য নিজের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করছে। এ-রাষ্ট্রকে দৃঢ় করা যায় না যদি না লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষকে সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে টেনে আনা যায়; পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নততর শিল্পদক্ষতার ভিত্তিতে ছাড়া সমাজ-তন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না; আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও জ্ঞানের ব্যাপকতম প্রচার ছাড়া মানুষের মন থেকে পেটি-বুর্জোয়া ভাবধারার উচ্ছেদ করা যায় না। তাই শিক্ষাবিস্তার আর গণসংস্কৃতির ব্যাপকতম বিকাশ গত ত্রিশ বছর ধরে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ হিসাবে রয়েছে এবং আজ নতুন গণরাষ্ট্রগুলির সামনে অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং গণরাষ্ট্রগুলির শাসনতন্ত্রে জন-

গণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার শুধু লিপিবদ্ধই হয় নি। দেশের সমস্ত সম্পদ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে মেহনতী জনতার করায়ত্ত করে, শ্রমিককে উপযুক্ত মজুরি এবং বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে, কৃষকের উদয়াস্ত খাটুনির লাঘব করে সে অধিকারকে বাস্তবরূপ দেওয়া হয়েছে। মেহনতী জনগণের সন্তানদের শিক্ষার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে সত্যিকারের সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তার সম্ভব করে তুলেছে।

তাই ১৬টি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণে বিধ্বস্ত শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রের নেতা লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হবে এবং বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতই এই যুদ্ধেও সমগ্র জনশক্তিকে জমায়েত করতে হবে। তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার স্টালিন দেশবাসীকে এই বলে আহ্বান জানাতে পারেন যে—প্রত্যেকটি শ্রমিক এবং কৃষককে সংস্কৃতিবান এবং শিক্ষিত করে তুলতে হবে। লেনিন-স্টালিনের এই আহ্বানই রূপ পেয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে। সেখানে ১২১ ধারায় বলা হয়েছে—"প্রত্যেক সোভিয়েট নাগরিকের শিক্ষালাভ করার অধিকার রয়েছে।" কিন্তু শুধু কাগজপত্রে অধিকারের স্বীকৃতি অর্থহীন, সেই, অধিকার জনসাধারণ যাতে সত্যিই ভোগ করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়া। সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রের মধ্যেই সে অধিকারের গ্যারাণ্টি লিপিবদ্ধ হয়েছে, বলা হয়েছে—"সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে উপরোক্ত অধিকার নিশ্চিত করার গ্যারাণ্টি দেওয়া হল।"

বাধ্যতামূলক শিক্ষার (অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার) অধিকার অনেক পুঁজিবাদী দেশেই কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী "সোনার দেশ" আমেরিকায়, সরকারী হিসাব মতেই, নিরক্ষরের সংখ্যা দুই কোটিরও বেশী। ১৯৪৯ সালের শেষে স্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে অথচ যেতে অক্ষম এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল আমেরিকায় ৬০ লাখ। আরও এককোটি এমন রয়েছে যারা বছরে যে তিন মাস তাদের কাজের অভাবে বসে থাকতে হয় সেই ক' মাস স্কুলে-কলেজে পড়তে পায়না। পুঁজিবাদের স্বর্গ আমেরিকায় জনগণের শিক্ষার অধিকার কার্যত এইভাবে নাকচ হয়ে যাবার কারণ—পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আমেরিকার মেহনতী জনগণকে দারিদ্র্যের এমন নরকে ডুবিয়ে রেখেছে যে, তাদের সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে পাঠানো অনেক বেশী দরকার হয়ে পড়ে।

অপরদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাদের বাজেটের শতকরা ৭১ ভাগ অস্ত্রসজ্জার জন্য ব্যয় করে—শিক্ষার জন্য শতকরা ১ ভাগের বেশী ব্যয় করার মত টাকা পায় না। গরীবের ঘরের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষার জন্য যে টাকা দরকার তাই দিয়ে ভরে ওঠে অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের মুনাফার পাহাড়।

কাগজে অধিকার আর বাস্তবে অধিকার ভোগ—এ দুয়ের মধ্যেকার এই ব্যবধান দূর করা সম্ভব হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নে। সেখানে মেহনতী জনগণকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের সন্তানদের শ্রমের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করেছে। শিক্ষার অধিকারকে বাস্তব করেছে। শুধু তাই নয়। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের মধ্যেই এই বিধান লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, "যে সকল ছাত্র কৃতী তাদের জন্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে; প্রত্যেক বিদ্যায়তনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে; কলকারখানায়, সরকারী খামারে, মেশিন-ট্রাক্টর কেন্দ্রে এবং যৌথ খামারে অবৈতনিক বৃত্তিশিক্ষা, শিল্পবিদ্যা এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে মেহনতী জনগণের জন্য।"

সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়ন শান্তির অগ্রদূত। সাম্রাজ্যবাদী বেষ্টনীর মধ্যে থেকেও তার বাজেটের মাত্র ১৬-১৭ ভাগ খরচ হয় সামরিক খাতে। তাই তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে শিক্ষার জন্য খরচ বছরের পর বছর বাড়িয়ে যাওয়া। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েটে শিক্ষার খাতে ব্যয় হয়েছে ১৯৪০ সালের আড়াই গুণ, ৬০৮০ কোটি রুবল।

জারের আমলে (১৯১৩) রুশিয়ায় মাত্র শতকরা ১৩ জন লোক লিখতে পড়তে পারত, আজ সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে একজনও নিরক্ষর নেই। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে শিক্ষা বিস্তারের ছবি আরও পরিষ্কার হবে মধ্য-প্রাচ্যের সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের উদাহরণ ধরলে। ১৯১৭ সালে উজবেকিস্তানে শতকরা মাত্র ২ জন লেখাপড়া জানত; মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ২১৬; সেখানেও শিক্ষা দেওয়া হত উজবেক ভাষায় নয়, রুশ ভাষায়। আজ সোভিয়েট উজবেকিস্তানে স্কুলের সংখ্যা সাড়ে চার হাজার, ছাত্রসংখ্যা ১১ লাখ ৪০ হাজার। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চতম বিজ্ঞান শিক্ষার বাহন হয়েছে উজবেক ভাষা।

১৯১৬ সালে সারা রুশিয়ায় সেই ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৮ লাখ। মাধ্যমিক

এবং উচ্চশিক্ষা পাবার সৌভাগ্য ছিল শুধু ধনীর দুলালদের। মোট ৯১টি উচ্চশিক্ষালয়ে ছাত্র ছিল এক লাখ বার হাজার। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েটে সব রকম বিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন কোটি ৩৯ লাখে। টেক্‌নিকাল স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ২০ লাখ। উচ্চশিক্ষা (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৩৭।

এই বিপুল শিক্ষাবিস্তারের ফলে স্বভাবতই সংস্কৃতি জগতেও জোয়ার জেগেছে। একটা হিসাব দিলেই যথেষ্ট হবে—সোভিয়েট আমলে সেখানকার জনসাধারণ ৯ লক্ষ রকম বইয়ের ১১ লক্ষ কোটি কপি ক্রয় করেছে।

সোভিয়েটের সংকটমুক্ত সমাজতন্ত্রী আর্থনীতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে ক্রমাগত শিল্পবিস্তার, উৎপাদন বৃদ্ধি। তারই প্রয়োজনে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক এবং কৃষক একযোগে শ্রমের দক্ষতা বাড়াবার চেষ্টা করছে —খাটুনি বাড়িয়ে নয়, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি এবং শিল্পদক্ষতাকে একত্র মিলিয়ে। কায়িক শ্রম এবং মানসিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য এবং বিরোধ ক্রমে লোপ পাচ্ছে। স্টালিনের মহান আহ্বান সার্থক হয়ে উঠছে, প্রত্যেক শ্রমিক এবং কৃষক শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান হয়ে উঠছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে নতুন মানুষ, শতদলের মত ফুটে উঠছে নতুন সংস্কৃতি।

* * *

ভারতের শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে। জাগ্রত গণশক্তির ক্রমবর্ধমান অভিযানের হাত থেকে দেশী-বিদেশী শোষকদের, সাম্রাজ্যবাদ-ধনিক-জমিদার জোটকে রক্ষা করার জন্যই এই শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্রযন্ত্রকে যতদূর সম্ভব জনগণের নাগালের বাইরে রাখাই এর উদ্দেশ্য। স্বভাবতই, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ও বিকাশে সাহায্য করা তো দূরের কথা, এর প্রতিটি ধারা জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। এর গণবিরোধী রূপই একে শিক্ষা ও সংস্কৃতি-বিরোধী করেছে।

নতুন শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে এবং করবে তার বিস্তৃত আলোচনা না করেও, কয়েকটা উদাহরণ থেকেই মোটামুটি সিদ্ধান্তে পৌছান যেতে পারে।

শাসনতন্ত্রে শ্রমিককে কাজ পাবার অধিকার, বাঁচার মত মজুরি পাবার অধিকার, উপযুক্ত বিশ্রামে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। কৃষককে জমির

উপর অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তার উদয়াস্ত খাটুনি এবং অর্ধাহারকে চিরস্থায়ী করেছে। শুধু তাই নয়, শাসনতন্ত্রের বিধানের বাইরেও শ্রমিক কৃষক যাতে তার নিজের সংঘশক্তি এবং আন্দোলনের জোরে এসব অধিকার কায়েম করতে না পারে সেজন্য সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থাকে চালু রাখার, তীব্রতর করার পাকা ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে করা হয়েছে। এর ফল দেশের সংস্কৃতিজীবনে কি হবে তা বোঝা কষ্ট নয়। দেশের মধ্যে যারা বিপুল সংখ্যাধিক সেই শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনগণ যদি উদয়াস্ত খেটেও মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ না পায়, দিনান্তে অন্নচিন্তার বাইরে কিছু দেখবার ভাববার মত সময় না পায় তাহ'লে দেশের কোন সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় শোষকরা হচ্ছে একমাত্র অবসরভোগী, সেখানে সংস্কৃতি বাঁচে না, সংস্কৃতির নামে যা বাঁচে সে হচ্ছে প্রমোদক্লান্ত শোষকশ্রেণীর অবসর বিনোদনের উপকরণ এবং শ্রমজীবী জনতার সমস্ত শুভবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করার প্রচারযন্ত্র।

সংস্কৃতির বিকাশের মূলে এই যে আঘাত, এ সমস্ত সাহিত্যিক-শিল্পির প্রকৃত স্বাধীনতার বিরুদ্ধেও আক্রমণ। সাধারণ মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এ শাসনতন্ত্র শিল্প ও সাহিত্যকে মুষ্টিমেয় শোষকের সম্পত্তি করে রাখার ব্যবস্থাকেই কায়েম করছে এবং তার ফলে প্রত্যেক শিল্পী সাহিত্যিককে এই বর্বর শোষকদেরই উপর নির্ভরশীল, তাদের হুকুম বরদার হয়ে থাকতে হবে। অথবা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, শিক্ষার ব্যাপকতম প্রসারের বুনিয়াদ ছাড়া প্রগতিশীল সংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশ অসম্ভব। এই দিক থেকে বিচার করলেও নতুন শাসনতন্ত্রের সংস্কৃতি বিরোধী রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অংশে, "রাষ্ট্রনীতির কার্যকরী মূলনীতি" নামক অধ্যায়ে চাকুরি, শিক্ষা, সমান খাটুনির জন্য সমান মাইনে ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে (বা শাসনতন্ত্রের আর কোথাও) একবারও এ কথা বলা হয়নি যে, রাষ্ট্র সমস্ত মানুষকে জীবনধারণের উপযোগী কাজ দিতে, তার বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে বাধ্য থাকবে। তার বদলে বহু বাগাড়ম্বরের পর বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র জনসাধারণ ও নও-জোয়ানের জন্য কাজ, শিক্ষা ইত্যাদির সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। কংগ্রেসী শাসকদের "চেষ্টা"র মূল্য যে কি তা আজ দেশ হাড়ে হাড়ে বুঝছে। কিন্তু এই ফাঁক রেখেও নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে শাসনতন্ত্রের ৪১নং ধারায় আরও

বলা হয়েছে যে, "**রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও অগ্রগতিতে যা কুলায় এমন ধরনের কাজ ও শিক্ষার অধিকার জনসাধারণকে দেবে।**"

কি সে 'অর্থনীতি' যার সঙ্গে সংহতি রেখে রাষ্ট্র 'শিক্ষার অধিকার জনসাধারণকে দেবে'? সে হল সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে যুদ্ধায়োজনে দেশের টাকা নষ্ট করার। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য সব কিছু থেকে কেটে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়াবার তাঁবেদারী অর্থনীতি। সেই অর্থনীতি রূপ পেয়েছে অর্থমন্ত্রী মাথাইয়ের বাজেটে—যেখানে যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের অর্ধেকেরও বেশী, যেখানে কোটিপতি ব্যবসায়ীদের উপহার দেওয়া হয়েছে সাড়ে সতের কোটি টাকা, কয়েক ডজন বৃটিশ সৃষ্ট রাজামহারাজার বাৎসরিক দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে ৪ কোটি টাকার আর জেলার ৩০ কোটি লোকের শিক্ষার প্রয়োজনে বরাদ্দ হয়েছে ৩ কোটি টাকারও কম, বাজেটের শতকরা একভাগেরও কম।

একথা আজ একজন শিশুর কাছেও দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে, সরকারের বাজেটের অর্ধেকেরও বেশী বরাদ্দ হয় যুদ্ধে ও মিলিটারীর খাতে, যে ব্যবস্থায় ধনিক রাঘববোয়ালেরা মুনাফার পাহাড় বানায় কিন্তু তাদের মুনাফার এক পয়সাতে পর্যন্ত হাত পড়ে না, সে কংগ্রেসী সরকার কোনও দিনই তাদের "অর্থনৈতিক ক্ষমতার" মধ্যে মানুষের জীবনধারণের, শিক্ষার ও সংস্কৃতির ব্যবস্থা করে উঠতে পারবে না। এবং এ ব্যাপারে কোন বিচারকের দরবারে যাওয়া চলবে না কারণ শাসনতন্ত্রে সোজাসুজি বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র আইনত সর্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য দায়ী থাকবে না। অর্থাৎ নতুন শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের মূল অধিকারের জালে এত বড় বড় কয়েকটা ফুটো রাখা হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে জীবনধারণের মত কাজ, শিক্ষা ও সুখী জীবনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধনিক শাসকশ্রেণী সর্বদা মেহনতী মানুষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবে।

এটা একটা তর্ক বা ভবিষ্যতের কথা নয়। বড় বড় প্রতিশ্রুতি ও কথার পর্দার আড়ালে গত আড়াই বছর কংগ্রেসী সরকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশকে কী দিয়েছে তার একটু হিসাব করলেই আরও নগ্নভাবে এই সত্য ধরা পড়ে যায়।

শাসকশ্রেণীর আজ প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ধনিকশ্রেণী ও

উচ্চ মধ্যবিত্তের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা—মজুর-কিসান ও গরীব মধ্যবিত্ত শিশু ও নওজোয়ানদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা তাই গত আড়াই বছরে বার বার ইস্কুলের ও কলেজের ছাত্রদের মাইনে বাড়ান হয়েছে প্রত্যেক প্রদেশে, ছাত্রদের ভর্তি হবার সংখ্যাকে জোর করে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এই মাগ্‌গীর বাজারেও ছাত্রদের কাগজ ও বইখাতাপত্রের দাম আরও চ[illegible]য় দেওয়া হচ্ছে। এই জঘন্য চক্রান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একটি নিখিল ভারত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"এই সব সরকারী নীতির পূর্ণ পরিণাম বোঝা যাবে বছর দুই বাদে। কিন্তু শিক্ষাজীবনে এই আক্রমণের ফল কী হবে তার নমুনা নিম্নলিখিত তথ্য থেকে খানিকটা বোঝা যাচ্ছে। মাদ্রাজ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে, শুধুমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশে এক ১৯৪৭ সালেই ৪,৮৭০টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মালাবারে, সরকারী তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৭ সালে ১৭,৯৫৪ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।"

শুধু মাদ্রাজ আর মালাবারে নয়, বোম্বাই, বাংলা, আসাম ও অন্যান্য সমস্ত প্রদেশেও একই অবস্থা। ১৯৪৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, ফয়জাবাদে এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সম্পাদক ও কংগ্রেস নেতা গোবিন্দ সহায় বলেন : "গত বছরে ৭৩,০০০ ছাত্রছাত্রী হাইস্কুল পরীক্ষা দেয়। তাদের মধ্যে ৬৩,০০০ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কিন্তু মাত্র ৭,০০০ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকেরা তাদের আরও পড়াবার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। বাকী ৫৬.০০০ হাজার, যাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল, তাদের চাকরির ব্যবস্থা আমরা কী করে করব?"

জনসভায় প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে গোবিন্দ সহায় একটু ন্যাকাকান্না কাঁদতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু সাধারণত কংগ্রেসী নেতারা এ বিষয়ে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে স্পষ্টবাদী। যেমন মাদ্রাজের শিক্ষামন্ত্রী মাধব মেনন এক ছাত্র প্রতিনিধিদলকে মুখের উপর বলে দিয়েছেন—"সরকার তার খুশিমত ছাত্রদের মাইনে বাড়াবে......যাদের পয়সা আছে শুধু তাদেরই লেখাপড়ার চেষ্টা করা উচিত।" নওগাঁয় এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এরই প্রতিধ্বনি করে আসামের প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলুই বলেন : "যাদের পয়সাকড়ি নেই তাদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিদায় নেওয়াই ভাল।" অবশ্য অন্যান্য সব ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও অন্যদের টেক্কা দিয়েছেন পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী বিধান

জন্য সপ্তাহে মাত্র ৩ দিন করে স্কুলের ব্যবস্থা থাক—বাকী ৩ দিন মেহনত করে তারা স্কুলের মাইনেটা রোজগার করুক। এইভাবেই ধনিক কংগ্রেসী নেতারা বিনা বেতনে দেশের সমস্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেবার দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

মওলানা আজাদের ঘোষণার অর্থ প্রদেশে প্রদেশে কি দাঁড়াবে তার নমুনা পশ্চিম বাংলাতে ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষদের সম্মেলনে পশ্চিম বাংলার রায়-মন্ত্রিসভা প্রস্তাব রেখেছেন যে, ১৯৫০এর জুলাই (অর্থাৎ নতুন সেশন) থেকে কোন কলেজে ১৫০০ ছেলের বেশী ভর্তি করা যাবে না। বর্তমানে কলকাতার কলেজগুলিতে গড়ে প্রত্যেকটিতে চার থেকে পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পড়ে। রায়-মন্ত্রিসভার এই নতুন প্রস্তাবের সোজা মানে হ'ল—প্রত্যেক কলেজ থেকে কমপক্ষে ২ থেকে ৩ হাজার করে ছাত্র-ছাত্রীকে তাড়িয়ে দেওয়া। এবং নতুন কলেজ খোলার কোন মৎলবই যখন তাদের নেই, তখন ঐ বিতাড়িত ছাত্রদের ভাগ্যে পড়াশুনো ইতি হয়ে যাবে চিরদিনের মত।

* * *

জনগণের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপর এই আক্রমণেরই অংশ ভাষা সম্পর্কে নতুন শাসনতন্ত্রের বিধান। শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দী এবং ইংরেজী। অবশ্য বলা হয়েছে যে, ১৫ বছর পরে একবার বিচার করে দেখা হবে যে, ইংরেজী তার পরও রাষ্ট্রভাষা থাকবে কিনা। সে বিচারের ফল কি হবে তা বোঝা কিছু কষ্ট নয়। শিল্প জাতীয়করণ আপাতত পাঁচবছরের জন্য স্থগিত রেখে তারপর ক্রমে কিভাবে চিরতরে বর্জন করা হল তার অভিজ্ঞতা এখনও লোকের মন থেকে মুছে যায় নি।

শাসনতন্ত্রের রচয়িতাদের সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাঁবেদারীর নগ্ন চেহারা ভাষা সম্পর্কে তাদের এই নীতির মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে দেশকে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্ত করা তো দূরের কথা ইংরেজী ভাষার নাগপাশ থেকে জাতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতিকে মুক্ত করার অধিকার পর্যন্ত এদের নেই, সাম্রাজ্যবাদের দরজায় টিকি এমন করেই বাঁধা! ইংরেজের গড়া রাষ্ট্রযন্ত্র, ইংরেজের দ্বারা শিক্ষিত আমলাতন্ত্র আর সামরিক অফিসার, ইংরেজ সেনাপতি আর

সমর পরামর্শদাতা, ইংরেজ আর আমেরিকান শিল্প বিশেষজ্ঞ নিয়ে দেশকে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধঘাঁটিতে পরিণত করাই যাদের উদ্দেশ্য—তাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব হবে ভারতীয় ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা? তারা বড়জোর পারে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার ইংরেজী ভাষার পাশে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের হাতিয়ার হিসাবে হিন্দীর স্থান করে নিতে। ঠিক যেমন রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের পায়ের কাছে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাদের মালিক মারোয়াড়ী-গুজরাটি ধনিক গোষ্ঠী। এটা যে মারোয়াড়ী-গুজরাটি কোটিপতিদের হিন্দী-প্রীতির ব্যাপার মোটেই নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষা হবে দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দী ভাষা। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল এবং জাতির ভাষার সমান অধিকারের উপর এই আক্রমণ হচ্ছে এই সব অঞ্চলের জনসাধারণকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত করার হাতিয়ার। শাসকগোষ্ঠীর এই ভাষানীতির তাৎপর্য সম্পর্কে একটি ছাত্র সংগঠনের প্রস্তাবের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য:

"আজকের দিনে মারোয়াড়ী আর গুজরাটি পুঁজিপতিরাই সমস্ত ভাষার উপর একটি ভাষার আধিপত্য চায় ও ভারতের বাজারে বৃটিশদের জায়গা দখল করতে ইচ্ছুক এবং সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর ভাষাগত অঞ্চল আর পশ্চাৎপদ এলাকাকে শোষণ করতে গিয়ে এরা ব্যবসাবাণিজ্য আর কলকারখানা মারফত শোষণের স্বার্থে একটি ভাষা থাকার আবশ্যকতা উপলব্ধি করছে। এ পর্যন্ত ইংরেজী যে উদ্দেশ্য সাধন করে এসেছে—নতুন রাষ্ট্র প্রবর্তিত হিন্দী সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করবে। শ্রমজীবীদের উপর শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক আর অর্থ নৈতিক আধিপত্যের জন্য এই ভাষা তাদের ভিতর আলাপ আলোচনার এবং যোগাযোগের এক সাধারণ মাধ্যম সৃষ্টি করে শোষক আর তাদের ভৃত্যদের ঐক্যবদ্ধ করার হাতিয়ারে পরিণত হবে।

"রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া হিন্দী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষাকে পিষে মারবার, তাদের দমন করার হাতিয়ারে পরিণত হবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের আর ভাষার সমান মর্যাদার অধিকারকে নাকচ করে দেওয়া ছাড়া এ আর কিছু নয়। ভারতীয় ইউনিয়নের এক মাত্র রাষ্ট্রভাষা

হিন্দী হওয়ার ফলে অ-হিন্দীভাষী জনসাধারণ নিজেদের ভাষায় আইনকানুন ইত্যাদি থাকার অধিকার হারাবে; রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা কোন অংশ গ্রহণ করতে পারবে না; এইভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রভৃতির কাজ কর্মে অংশ গ্রহণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে অ-হিন্দীভাষী লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে।

"হিন্দীর এই বিশেষ মর্যাদা থাকার ফলে, এই বৈষম্যমূলক মর্যাদা জিইয়ে রাখায় রাষ্ট্র হয়ে পড়বে বিশেষ আগ্রহশীল; হিন্দীকেই সমস্ত সুবিধা দেওয়া হবে, আর অন্য সমস্ত ভাষার উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। কারণ রাষ্ট্রের সব সময়ই ভয় থাকবে যে, অন্যান্য ভাষার উন্নতিতে সে সমস্ত ভাষাকেও সমান মর্যাদা দেবার দাবি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে বারবার। এইভাবে অন্যান্য ভাষাকে দমন করাই হয়ে দাঁড়াবে রাষ্ট্রের স্বার্থ।

"একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার অর্থ হল অন্য সমস্ত জাতির এবং ভাষা-গোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষার উন্নতি সাধনের উপর, সমস্ত ভাষার সমান অধিকারের উপর আক্রমণ করা। পুঁজিপতিদের মধ্যেকার প্রধান গোষ্ঠী—মারোয়াড়ী-গুজরাটি গোষ্ঠীর দ্বারা ছোট ছোট জাতিদের দমন করার চেষ্টার এটা সূত্রপাত মাত্র।"

বলা বাহুল্য মারোয়াড়ী-গুজরাটি শাসক-গোষ্ঠীর এই হিন্দী-প্রীতির পিছনে হিন্দীভাষী মেহনতী জনগণের প্রতি দরদের লেশমাত্র নেই। এ হচ্ছে বিভিন্ন জাতির মেহনতী জনতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মারোয়াড়ী-গুজরাটি গোষ্ঠীর শোষণ আর শাসন হিন্দী এবং অ-হিন্দীভাষী—সকলের উপর আরও জোরদার করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা।

* * *

শাসকশ্রেণী একথা জানে যে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ভাষার বিরুদ্ধে এই আক্রমণের প্রতিবাদ হতে বাধ্য এবং হচ্ছে। এবং এই প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, শাসকশ্রেণীর সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে নতুন গণ-সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে। তাই এই আন্দোলন দমন করার সমস্ত রকমের প্রগতিশীল চিন্তাধারার কণ্ঠরোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা চলেছে।

প্রত্যেক প্রদেশ এ ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে। ১৯৪৯ সালের ১৫ই নভেম্বর বোম্বাইয়ে এক ফতোয়া জারি হয়েছে যে, কোন ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক বা অধ্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনে বা সংগঠনে অংশ

গ্রহণ করতে পারবে না। এর অল্প কিছু দিন আগেই মাদ্রাজ সরকার সমস্ত স্কুল কলেজ থেকে কমিউনিস্ট বলে কথিত প্রত্যেকটি ছাত্র ও শিক্ষককে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শুধু মাত্র "কমিউনিস্ট" এই অভিযোগে বিতাড়িত করেছে। পশ্চিম বাংলায় স্কটিশ চার্চ কলেজ ও গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে মোট ১০ জন ছাত্রকে বিতাড়িত করা হয়েছে। অধ্যাপকদের জীবনধারণের উপযোগী মাইনের দাবিতে নমুনা ধর্মঘট করায় আশুতোষ ও বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপক বিতাড়ন শুরু হয়েছে।

গ্রেপ্তার করা হয়েছে অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীকে। বিনাবিচারে ভারতের বিভিন্ন জেলে কমপক্ষে ৪।৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আটক রয়েছেন। শিক্ষায়তনের পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকারকে বারবার পদদলিত করা হয়েছে। গত ২ বছরে পশ্চিম বাংলায় মোট ৫ বার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছাত্রদের উপর লাঠি ও গুলি চলেছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আর এক কাঠি উপরে গেছে। সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে গত দু'বছরে সারা ভারতে সংগ্রামী তরুণদের যে কত জুলুম সহ্য করতে হয়েছে শুধু তারই একটা পূর্ণ রোজনামচা দিতে গেলে এই পত্রিকার একটা গোটা সংখ্যার আয়তন লাগবে।

শুধু স্কুল কলেজগুলিই বন্দী-শিবিরে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে তা নয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাজীবনে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ও চিন্তাধারার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলেছে। একমাত্র পশ্চিম বাংলাতেই ৯টি দৈনিক পত্রিকা ও প্রায় কুড়িটি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মার্কসবাদী ও সোভিয়েট সাহিত্যের প্রচার যন্ত্র 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি'র দরজায় পর্যন্ত তালা পরেছে। এমনকি কাব্য ও নাটকও রেহাই পায় নি। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ শ্রমিক নাট্যকার আন্নাভাউ সাঠের "লোকমন্ত্রী" নাটকের প্রদর্শনী বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। অন্যত্র প্রদেশে "মাভূমি" নাটক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ১৮৭৬ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রচিত "ড্রামাটিক পারফরমেন্স এক্ট"কে পুনরুদ্ধার করে পশ্চিম বাংলায় প্রগতিশীল নাটক অভিনয় ও গানের জলসা

বন্ধ করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। ছাপাখানা থেকে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের নতুন কাব্যগ্রন্থ 'নানকিং'-য়ের সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনকি ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে সিনেমা-ছবির উপর পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাকে এইভাবে এদিকে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ত-বুর্জোয়া, জোটের পোষা অফিসার এবং মালিক দুলালদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার, এমনকি মধ্যবিত্তদের পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা—অপর দিকে সমস্ত নাগরিক স্বাধীনতা হরণ করে, প্রগতিশীল ভাবধারার কণ্ঠরোধ করে নতুন সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করার চেষ্টা। শুধু তাই নয়—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত বাধাকে অগ্রাহ্য করে, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেটুকু সংস্কৃতি বহু মনীষির অক্লান্ত চেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছে তাকে পর্যন্ত আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে তাঁবেদার রাষ্ট্রের ছাঁচে ঢালা তাঁবেদার সংস্কৃতিতে পরিণত করার চেষ্টা হচ্ছে প্রাণপণ। সিনেমা সেন্সর করছে পুলিসের কর্তারা, বেতার নিয়ন্ত্রণ করছে হোম ডিপার্টমেণ্টের আমলারা। এর ফল কি হচ্ছে তা একটি উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। সম্প্রতি কোন এক সিনেমা প্রতিষ্ঠান স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকখানা সেন্সর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। অনুমতি মেলে না। কেন মিলল না তা জানতে গেলে সেন্সর কর্তারা জানিয়ে দেন—"লেখক দীনবন্ধুবাবুকে নিয়ে আসুন, তাকে বুঝিয়ে দেব।" দীনবন্ধুবাবুর নিতান্ত ভাগ্য যে তাঁর নামে এখনও এরা নিরাপত্তা আইনে ওয়ারেণ্ট বের করে নি! এমনই বর্বরদের হাতে আজ সিনেমার ভার—যে সিনেমা হচ্ছে বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন।

একদিকে দেশের মধ্যে পুলিসী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার এই চেষ্টা, আর অপরদিকে বাইরে থেকে 'মার্কিনী' সংস্কৃতি (মার্কিনী মূলধনের অপরিহার্য লেজুড়) আমদানি হচ্ছে বেনোজলের মত। হিংস্রতম যুদ্ধপ্রচারে ঠাসা এবং জঘন্যতম যৌন-উত্তেজনাপূর্ণ ছবিতে সাজান আমেরিকান বই আর সাময়িক পত্রিকায় বাজার ছেয়ে গেছে, অথচ শান্তি ও স্বাধীনতার প্রচারক 'নিউ টাইমস' পত্রিকা কাস্টমস্ বিভাগের জালে আটকা পড়ে গুদামে পচছে। মার্কিনী যুদ্ধ-সংস্কৃতির প্রচারকরা শতে শতে দেশের মাটি চষে বেড়াচ্ছে অথচ সোভিয়েটের বিশ্ববিখ্যাত লেখক টিখনভ বা তুরসুন জাদা শান্তি সম্মেলনের

জন্যও এদেশে আসার অনুমতি পাচ্ছেন না। দেশের একচেটিয়া সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে। মার্কিনী মাহাত্ম্যের একনিষ্ঠ প্রচারক, আমেরিকান কন্সাল অফিসের শিল্প-সহকারী (পড়ুন—আড়কাঠি) শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছে।

এমনি করেই তাঁবেদার রাষ্ট্রের হাতিয়ার তাঁবেদার সংস্কৃতি গড়ে তোলার সর্বব্যাপী অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন শাসনতন্ত্রে এই অভিযানকেই আরও ব্যাপক আরও জোরদার করার ব্যবস্থা হয়েছে।

* * *

এ কথা স্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদ এবং তার তাঁবেদারদের জনতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করাই যে শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য তার আমলে জাতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত বিকাশ অসম্ভব। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব সেই ব্যবস্থায় যেখানে রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত, রাষ্ট্র ক্ষমতা যেখানে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারদের হাতে নয়—মেহনতী জনগণের হাতে, যে ব্যবস্থায় কৃষক পাবে জমি, আর শ্রমিক পাবে বাঁচার মত মজুরি; যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই দরকার হবে জনগণের মধ্যে শিক্ষা আর সংস্কৃতির ব্যাপকতম বিকাশ। শিক্ষা আর সংস্কৃতির জন্য লড়াই যে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি এবং শান্তির লড়াইয়ের, সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়েরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেই পুরাতন সত্যকেই নতুন শাসনতন্ত্র আর একবার প্রমাণ করে দিল।

—প্রসন্ন সরকার

পাথরের ফুল

[সোভিয়েট ছায়াচিত্র (হিন্দি)]

বৃদ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় "কে বলে পাথরের ফুল নাই, আমি জানি প্রকৃত পাথরের ফুল আছে, আমি উহা আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সফলকাম হই নাই, আরও শ্রম করিবার প্রয়োজন ছিল।"

হাঁ বৃদ্ধ ঠিকই বলিয়াছেন, সাম্যবাদ কি অত সহজে মেলে? তাহার জন্য শ্রম ও বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। স্ত্রীর ক্রন্দন আর আত্মীয়বর্গের মলিন মুখ, সকল কিছু উপেক্ষা করিয়া উহা পাইবার আশায় অদম্য উৎসাহ লইয়া পথে বাহির হইতে হইবে। তবেই না মনের মতন জায়গায় পৌঁছাইতে পারিবে। যেখানে পাথরের ফুল ফোটে সেখানে নাই মালিকের জুলুমবাজী, মালিকের চাবুক খেয়ে পিঠে কালশিরা পড়ে না, সেখানে মালিকের তাগাদায় কাজ করিতে হয় না, সেখানে অনাহারে মানুষ শীর্ণ থাকে না, সেখানে মানুষ সকল কুসংস্কার কাটিয়ে, সকল মলিনতা থেকে উর্ধ্বে উঠে, বাস করে সুখে ও শান্তিতে। রোগী পায় চিকিৎসা আর শ্রমিক পায় শ্রমের প্রকৃত মূল্য। মালিকের দয়া সেখানে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ভ্রাতৃপ্রেম আর বন্ধুত্ব।

পাথরের ফুল আবিষ্কার করিবার জন্য দানিলুস্কার মতন একটি জঙ্গী, নওজোয়ান শ্রমিক যেমন আগাইয়া আসিয়াছিল, সকল বাধা-বিপত্তি জয় করিয়া, সেইরকম দেখা যায় বর্তমানের শ্রমিক লড়াই দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, মিলে আর জমিনে। "পাথরের ফুল" ছায়াচিত্রে বৃদ্ধ যেমন দানিলুস্কাকে পথ দেখাইয়াছিল—সেই রকম অগ্রগামী বাহিনী আজ কারা-অন্তরালে। কিন্তু একি! তাহাদের কার্যের সিদ্ধির জন্য দলে দলে কত নির্ভীক বাহিনী আগাইয়া আসিতেছে। তাহারা বুলেটের ভয় করে না; তাহারা আগাইয়া চলার জাত, তাহারা আগাইয়া চলিবেই। কেহই দানিলুস্কাকে যেমন রুখিতে পারে নাই—তেমনই উহাদিগকেও কেহই রুখিতে পারিবে না। উহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

—জগেন্দ্রনাথ মুন্সি

পরিচয়

লাম কুদ্দুস :: সম্পাদক :: সরোজকুমার দত্ত

: ১৯৫০ নব পর্যায় : চতুর্থ সংখ্যা চৈত্র : ১৩৫৬

দাম : আট আনা